বিক্ষুব্ধ বাঙলা

শ্রীবিশ্ব বিশ্বাস

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস • কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৬৬

প্রচ্ছদ :
শ্রীগণেশ বসু

মুদ্রক :
শ্রীঅজিতকুমার দত্ত
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

যুগে যুগে যখনই অত্যাচার, অনাচার, অবিচার মানুষের সমাজে দেখা দেয় তখনই হয় বিপ্লবের সম্ভাবনা। বিপ্লবের উৎপত্তি ও গতিবেগ নির্ভর করে শোষিত সমাজের মানুষের উপর। যে সমাজের মানুষ যতই সচেতন ও সংবেদনশীল সেই সমাজে বিপ্লবের গতিবেগ হয় ততই প্রবল ও অবিরাম।

আমাদের বাংলা তাই বিপ্লবের ক্ষেত্রে চিরদিন অগ্রগামী, বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে আপামর জনসাধারণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে। বিপ্লবের ক্ষেত্রে বাংলার অবদান যে বিতর্কিত নয় তা আজ সকলেই স্বীকার করছেন।

পরাধীনতা, যুদ্ধ, দাঙ্গা, হানাহানি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বঙ্গব্যবচ্ছেদ, পথে পথে বাস্তুহারার আর্তনাদ—আর অন্যদিকে ধনিকের ভোগবিলাস, মানুষের ভাগ্য নিয়ে উপহাস। —রাজনীতির খেলা নির্মম নিষ্ঠুর। চক্র-চক্রান্তে দীর্ণ বাংলার বুকে আজ বিপ্লবের জোয়ার। যুগে যুগে বিপ্লবের সমাবেশে বিপ্লবী বাংলা এঁকেছে তার শক্ত মুঠির চিহ্ন···ভবিষ্যতের পথও দেখাবে এই বিপ্লবী বাংলা।

"কী গাহিবে, কী শুনাবে! বলো মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে
মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা,
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজল ধারা
মস্তকে পরিবে ঝরি—তারি মাঝে যাবো অভিসারে
তার কাছে, জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে-
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।"

—রবীন্দ্রনাথ

দস্যু পদপাদুকার তলে
অশুচি কর্দম সেই
চিরচিহ্ন দিয়ে গেছে
তোমার দুর্ভাগা ইতিহাসে।

—রবীন্দ্রনাথ

॥ এক ॥

বণিকরাজ ইংরাজের শোষণ (১৭৫৭—১৭৭০)

বাণিজ্যের নামে লুট আর বাংলার শিল্প ও শিল্পী ধ্বংস

দুশ' বছর আগেকার বাংলার পল্লীর একখানা ছবি। চালে চালে বাড়ি। বাগিচা আর দীঘি ঘেরা গৃহস্থের সংসার-ধর্মের কোলাহলে সর্ব্বক্ষণ চঞ্চল। মাঠে মাঠে চলেছে হাল। নদীর বুকে সারি সারি নৌকা পাল তুলে চলেছে ভাঁটিয়ালি গানের সাথে দাঁড়টানার ছন্দে পল্লীর সোনার ফসল নিয়ে গঞ্জে আর বন্দরে বন্দরে।

দুপাশে পড়ে থাকত সোনার ফসলে ভরা প্রশান্ত প্রশস্ত মাঠ। পল্লীর কোলে পাতলা বনের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যেত সাদা চকচকে ছাদের আঁলিসা, মন্দির-মসজিদের শুভ্র চূড়া—আর শোনা যেত প্রতি সন্ধ্যায় কাঁসর, ঘণ্টা আর আজানের ধ্বনি।

স্বপ্নের মাঝে মিলিয়ে গেছে সে ছবি।

সর্ব্বনাশ করলে কারা সোনার বাংলার? কারা মাত্র দশ বছরে বাংলার বুকে নিয়ে এল শ্মশানের এই বিভীষিকা। কাদের শয়তানির মশালের আগুনে দুই শতাব্দীর মধ্যে পুড়ে ছারখার হ'ল বাংলার মাটি, বাংলার সমুদ্র, বাংলার সমাজ।

ঐযে ইংলণ্ডের বাপে তাড়ানো, মায় খেদানো কতকগুলো মানুষ পর্তুগীজদের দেখাদেখি জাহাজ নিয়ে ছুটেছে ভারতের দিকে। দেশে তাদের জোটেনি অন্ন। ঢুঁ মেরে তারা বেড়াচ্ছে বাংলার বন্দরে বন্দরে।

১৬১৬ সাল। ফিরিঙ্গী ডাক্তার বাউটন সম্রাট সাজাহানের কন্যাকে রোগমুক্ত করে নিজের স্বদেশীয়দের জন্য বিনা শুল্কে বাংলার সর্বত্র বাণিজ্য করবার আর কুঠি তৈরী করবার অধিকার পেল।

বসতে পেলে শুতে চায়। তারা চট্টগ্রাম দখলের জন্য গোপন আয়োজন করল। বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খাঁ তাদের বিতাড়িত করলেন। তারা লুটিয়ে পড়ল গিয়ে সম্রাট আওরংজেবের পায়। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে তারা বাংলায় ফিরে আসার অনুমতি পায়। কলকাতা আর কাশীমবাজার হয় তাদের আড্ডা।

তখন বাংলার সিংহাসনে বালক সিরাজ নবাব—দেশপ্রেমিক কিন্তু অবিচক্ষণ, অকৌশলী। শিয়রে ক্ষমতালোভী জ্যেষ্ঠদের ষড়যন্ত্র। শোষণলালসায় আতুর ইংরাজ বণিকের উস্‌কানি। বিদেশী বণিক আর স্বদেশী বিশ্বাসঘাতকদের মিলিত শয়তানির ফলে ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার দেশভক্তরা প্রাণ দিল।

পাপীর অধম মীরজাফর। লর্ড ক্লাইভের দেওয়া মুকুট তাঁর মাথায় কাঁটার মত মনে হ'ল। তাঁর মনের কোণেও উঁকি মারল ইংরাজ তাড়াবার স্বপ্ন। ডাচদের সাথে চলল তাঁর গোপন ষড়যন্ত্র। ইংরাজরা মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করল এবং সেই সঙ্গে জনপ্রিয় দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমারও অপসৃত হলেন। ইংরাজদের মোটা টাকা বকশিস্ দিয়ে বাংলার নবাবী নিলেন মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম। দুদিন যেতে না যেতেই তাঁর চোখে স্পষ্ট হ'ল ইংরাজ বণিকদের চাতুরী। বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে ইংরাজের সাথে তাঁর বিবাদ বাঁধল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবার ছিল অধিকার কিন্তু দেশীয় ব্যবসায়ীদের শুল্ক দিতে হ'ত। মীরকাশিম দেখলেন এতে দেশীয় বাণিজ্যের যেমন ক্ষতি, রাজস্বেরও তেমন ক্ষতি। তিনি দেশীয় ব্যবসাদারদের বাঁচাবার জন্য রদ করে দিলেন

বাণিজ্যশুল্ক। ইংরাজ বণিকরা আপত্তি জানাল। কিন্তু মীরকাশিমের সঙ্কল্প অটল। যুদ্ধ বাঁধল···

যুদ্ধে গিরিয়ার প্রান্তরে মীরকাশিম হারলেন।

নবাব হলেন মীরজাফর। এবারকার মীরজাফর একেবারে ইংরেজের হাতের-পুতুল।

দেশে শোষণ শুরু হ'ল।

শোষণের প্রথম বলি বাংলার তাঁতি। তাদের অপরাধ তাদের তৈরী বস্ত্র পৃথিবীর সেরা, তাদের হাতের তোলা রেশম ও মসলিন বিশ্বের দরবারে আদৃত।

কোম্পানির দাদন নাও আর মুচলেকা লিখে দাও: নির্দিষ্ট সংখ্যক কাপড় তৈরী করে দেব, আর অন্য কোন ব্যবসাদারের কাছে কাপড় বেচব না।

কাপড়ের দাম সাহেবরা যা ধার্য করে দেবে তাই নিতে হবে।

তাঁতিরা দেখল এত মস্তবড় জুলুম। ফরাসি, ওলন্দাজ, আরমানিদের কুঠিতে কাপড় বেচলে বেশী দাম পাওয়া যায় কিন্তু তা বেচবার জো নাই। এ জুলুমের কোন প্রতিকার নাই। কুলাঙ্গার মীরজাফর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,—ইংরাজদের বাণিজ্য কুঠির সাহেব ও গোমস্তা পেয়াদার কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। সুতরাং তাঁর কাছে সুবিচার পাবার আশা নাই।

আকুল বাংলার তাঁতিকুল। অত্যাচার নিপীড়নে তারা পাগল। কুঠির সাহেব, গোমস্তা, পেয়াদা তখন নবাব। অর্থগৃধ্নু, নীচাশয় এই পশুর দল সিপাই নিয়ে তাঁতিদের বাড়ি চড়াও হ'ত,···লুট করত, পুরুষদের মারত, মেয়েদের অপমান করত।

রেশম আর মসলিন যারা তুলত সে সব তাঁতিদের উপরও হ'ত জুলুম। তাদের ধরে কোম্পানির লোকরা নিজেদের কুঠিতে কাজে লাগাত। কাজের সময় কাছে বসে থাকে জমাদার। দোষ হলে মারে চাবুক। মাসে বেতন দেড় টাকা। পেয়াদা, জমাদার,

গোমস্তা তা থেকে দশ পয়সা জোর করে আদায় করে। ভয়ে তাঁতিরা নিজেদের আঙুল কাটে। কাটা আঙুলে তোলা যায় না রেশম। ছেড়ে দেয় সাহেবরা।

আবার কেউ কেউ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। ১৭৬৬ সালে এক রাত্রে কাশিমবাজার থেকে পালিয়ে যায় সাতশ' তাঁতি। বাংলার মাটিতে এমনি করে সেদিন বাংলার গৌরব বস্ত্রশিল্প লোপ পেল। একটি গল্প বলি,

সে সময় আমাদের দেশে ছিল একজন নামকরা তাঁতি। তার নাম সভারাম বসাক। সভারামের হাতের তৈরী একখানা কাপড়ের শিল্পনৈপুণ্য দেখে নবাব আলিবর্দি খুশি হয়ে তাকে পাঁচশ বিঘা নাখেরাজ জমি দান করেন।

সভারাম তৈরি করত বড় বড় ঘরের কাপড়।

হঠাৎ একদিন···

ইংরাজদের কুঠির গোমস্তা সিপাই নিয়ে হাজির হল তার বাড়ি। তার জামাই আর ছেলেদের ধরে নিয়ে গেল কুঠিতে। তাদের জোর করে দাদন দিল—আর একটা চুক্তিপত্রে তাদের সই করিয়ে নিল।

চুক্তিপত্রে কি লেখা ছিল তা তাদের পড়িয়ে শোনান হল না। দুমাস পর আবার তাদের হ'ল তলব।

সাহেব বলল—দু মাসের মধ্যে দু' হাজার রেশমী কাপড় তৈরি করে দেবার চুক্তি করেছিলে। কাপড় এনেছ ?

গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল সভারামের ছেলে আর জামাই।

তারা অনুনয় করে বলল—দু মাসে কি দু হাজার কাপড় তৈরি করা যায় ?

কুঠির গোমস্তা বলল—ধর্মাবতার, ওরা বড় বদলোক। সব কাপড় গোপনে সৈদাবাদে আরমানিদের কুঠিতে চালান করেছে।

সাহেব হুকুম করল—এদের কলকাতার জেলখানায় পাঠাও আর বাড়ির মাল ক্রোক করে দাদনি টাকা আদায় কর।

গোমস্তা এই চায়। সে জানত সভারামের বাড়িতে অনেক টাকা আছে। মাল-ক্রোকের নাম করে সে টাকা লুট করা চলবে।

সিপাইরা সভারামের বাড়ির মাল ক্রোক করতে আসছে। এই খবর পেয়ে ইজ্জতের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাল বাড়ির মেয়েরা। পিছু পিছু ছুটল সিপাইরা। মেয়েরা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ইজ্জত বাঁচাল।

সিপাইরা সভারামের বাড়ি ভেঙে মাটি খুড়ে তছ্‌নছ্‌ করে ফেলল। সভারামের যথাসর্বস্ব লুট হ'ল। কারা লুট করল! ইংরাজ?…না! আমাদের দেশের লোক। গোমস্তা, পেয়াদা, সেপাই সবাই বাঙালী!

* * *

এরপর মঙ্গলীদের অর্থাৎ যারা লবণ তৈরী করে তাদের পালা।

১৭৬৫ সন। বিলাত থেকে লর্ড ক্লাইভ এলেন।

কুষ্ঠরোগে মরলেন দেশদ্রোহী মীরজাফর।

মীরজাফরের ছেলে নিজামউদ্দৌলা তখন নবাব। নবাব ঠিক নয়…কোম্পানির হাতের কাঠের পুতুল।

বাংলায় নবাবের প্রতিনিধি রেজা খাঁ আর বিহারে সিতাব রায়। দুজনা-ই কোম্পানির দালাল। সকলে হাত মিলাল ইংরাজ বণিকদের সাথে—বাংলার কৃষক ও কারিগরদের শোষণের জন্য।

লর্ড ক্লাইভ দিল্লীর দুর্বল বাদশা শাহ আলমের কাছ থেকে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা দিয়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির জন্য লাভ করলেন। এতদিন

ইংরাজ বণিকরা বাংলার কারিগরদের শোষণ করছিল। এবার কারিগরদের সাথে চাষীদেরও শোষণের ব্যবস্থা হ'ল।

অপদার্থ বাদশা, অপদার্থ নবাব প্রজার মঙ্গল দেখলেন না··· চিনলেন শুধু বিলাসিতার অর্থ।

* * *

লর্ড ক্লাইভের পরামর্শে কোম্পানি লবণ, তামাক ও সুপারির একচেটিয়া ব্যবসা আরম্ভ করল।

এই বাণিজ্য সম্বন্ধে তারা প্রবর্তন করল একটি কঠোর নিয়ম। যারা লবণ, তামাক, সুপারি উৎপাদন করে তারা দেশের লোকের কাছে তা বিক্রি করতে পারবে না। তাদের তা ইংরাজ বণিকসভার নিকট বিক্রয় করতে হবে। ইংরাজ বণিকসভা বেচবে দেশের লোকের কাছে।

এরকম ঘুরিয়ে নাক দেখাবার কারণ কি?

কারণ ইংরাজ বণিকদের অর্থোপায়ের ফন্দি···বাণিজ্যের নামে চাষী কারীগরদের অর্থ লুট করার ফন্দি।

আগে মঙ্গলীরা প্রত্যেক মণ লবণ পাঁচসিকা দরে দেশীয় লোকদের নিকট বিক্রয় করত। এখন ইংরাজদের নিকট তারা বার আনা মণ দরে বিক্রি করতে বাধ্য হ'ল। পক্ষান্তরে দেশের লোক পাঁচসিকায় পাচ্ছিল এতদিন একমণ লবণ, এখন ইংরাজ বণিকসভাকে তাদের দিতে হল এক মণ লবণের জন্য সাত টাকা। বার আনায় জিনিষ কিনে ইংরাজ বণিকরা তা সাত টাকায় বিক্রয় করতে লাগল।

বাণিজ্য···না লুট?···

তারপর দেশীয় লবণ শিল্পী মঙ্গলীদের উপর শুরু হ'ল অকথ্য অত্যাচার।

আবার একটা গল্প বলি।

মেদিনীপুর জিলার কোন এক লবণ মহলে এক জমিদারের ছিল লবণের কারখানা। ইংরাজ বণিকদের বাংলার লবণ বাণিজ্যে ঐ

ভাবে যখন একচেটিয়া অধিকার হ'ল তখন জমিদার তুলে দিল লবণের বাণিজ্য।

মদন দত্ত নামে বর্ধমানের একজন লবণের ব্যবসায়ী সেখান থেকে লবণ কিনে বর্ধমানে ব্যবসা করত। লবণের দারোগা সন্দেহ করে মদন দত্তের বাড়ি তল্লাসি করল। তল্লাসির ফলে তার বাড়িতে পাওয়া গেল তিন সের লবণ। আর যাবে কোথা? কোম্পানির লবণ আফিসের সাহেব আর বাঙালী বাবুরা নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করল, যে মদন দত্ত গোপনে লবণের ব্যবসা করছে।

মদন দত্ত বলল—এ লবণ সংসার খরচের জন্য।

সাহেব বলল—মিথ্যা কথা। এত লবণ কি সংসারে লাগে! বাঙালী বাবুরা সাহেবের কথায় সায় দিল।

সাহেবের খানসামা আরও এক কাঠি উপরে। সে বলল—এক এক হাটে এক এক পোয়া লবণ আনি। তাতে এক হপ্তা চলে।

অতএব মদন দত্তের অপরাধ প্রমাণিত হ'ল। কলকাতার জেলে মদন দত্ত প্রেরিত হল। কুঠির গোমস্তা, পেয়াদা, সিপাই মদনের বাড়ি লুট করল। বাড়ির মেয়েরা পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিল। যখন তারা গ্রামে ফিরল তখন গ্রামের লোক তাদের সমাজে আশ্রয় দিল না—বলল: ফিরিঙ্গির স্পর্শে তোদের জাত গেছে।

বাংলার সমাজ তখন এমনই স্রোতহীন—অনড়, অধঃপতিত সমাজ। যাদের তারা রক্ষা করতে পারল না—তাদের জাতটা তারাই কেমন সহজে মারল।

সেই অধঃপতিত সমাজের বুকের উপর দিয়ে এমনি করে চলল ইংরাজ বণিকদের শোষণের রথচক্র।

॥ দুই ॥

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৭০)

শোষণের ফল

বাঙালীর নুন ভাত। নুন গেল। এবার ভাতের উপর পড়ল হাত। ইংরাজ বণিকরা ধানের ব্যবসা ধরল। দেশের পণ্য ধানের উপর তারা স্থাপন করল তাদের একচেটিয়া অধিকার।

বাঙালীর বাড়াভাতে পড়ল ছাই।

১৭৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ক্লাইভ ভারত ত্যাগ করলেন। চাষী, কারিকর, গরীবদের মেরে বাংলাকে খোঁড়া করবার সব ব্যবস্থা তিনি সম্পূর্ণ করে গেলেন।

১৭৬৮ সন। বাংলাদেশে ধান কম জন্মাল।

প্রজাদের নিকট থেকে কড়ায় গণ্ডায় খাজনা আদায় করল বাংলার দেওয়ান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। বীজধান পর্যন্ত বিক্রি করে প্রজারা খাজনা দিল। ইংরাজবণিকদের হাতে এসে পড়ল সব ধান। তাঁরা সেই ধান মাদ্রাজ ও কলকাতায় জমা করল। বেশী দামে সেই ধান বিক্রি হতে লাগল। চলল ধানের কালোবাজার।

১৭৬৯ সন। বৃষ্টি হ'ল না। চাষীদের ঘরে নেই বীজ ধান। চাষ হ'ল না। কিন্তু খাজনার তাগিদ্ চলল ঠিক। ঘরে যা দু মুঠো চাল ছিল তাও খাজনার জন্য বিক্রি হ'ল। ঘরে ঘরে চালের অভাব। বাজারে চাল পাওয়া যায় না। সব চাল রেজা খাঁ আর কোম্পানির ঘরে। কোম্পানি চাল জমিয়েছে কালোবাজারের জন্য, আর তাদের সিপাই, পেয়াদা, গোমস্তা দালালদের জন্য। ওরা বাঁচলেই চলবে তাদের বাণিজ্য। দেশের লোক বাঁচল, না মরল তাতে ইংরাজের কি ?

দ্বৈত শাসন। নবাবের উপর শাসনশৃঙ্খলার ভার……আর কোম্পানির উপর রাজস্ব আদায়ের ভার।

নবাবের প্রতিনিধি রেজা খাঁ আর সিতাব রায় ইংরাজের দালাল। শাসন শৃঙ্খলা কোথায়?

ইংরাজ অর্থ চায়। চায় প্রজা শোষণ করে রাজস্ব আদায় করতে। প্রজার মঙ্গল দেখবার কেউ নাই। প্রজার জন্য কারও দায়িত্ব নাই।

দেশে অরাজকতা। এই অরাজকতা সৃষ্টি করলেন লর্ড ক্লাইভ। ক্লাইভের অরাজকতায় (১৭৫৭—৭০) বাংলার মেরুদণ্ড ভেঙে স্থাপন করল বৃটিশ সাম্রাজ্য তৈরীর প্রথম সিঁড়ি।

পলাশীর যুদ্ধের পর এই অরাজকতা ক্লাইভ ইচ্ছা করেই কায়েম করলেন।

চারিদিকে গোলযোগে ইংরাজ সর্বেসর্বা হয়ে উঠল। গোলযোগের মধ্যে সকলে আসছে ইংরাজের কাছে। সকলেই হয়ে পড়েছে ইংরাজের কেনা গোলাম।

দেশের প্রধানরা হ'ল কাবু। আর সেই অবসরে ইংরাজ করতে লাগল বাণিজ্যের নামে লুট। একহাতে তারা ভাঙতে লাগল এদেশের শিল্প আর শিল্পীদের সমাজ, আর অন্য হাতে গড়তে লাগল নিজেদের কলকারখানা—বাঙালীর শুষে নেওয়া অর্থে আর বাঙালীর কেড়ে নেওয়া কাঁচামালে।

সোনার দেশ বাংলাদেশ হতে লাগল গরীব। আর গরীব ইংল্যাণ্ড হ'ল সমৃদ্ধিশালী।

আমাদের দেশের মঙ্গলীদের অন্ন মারা গেল, আর তাদের দেশে তৈরী হল লিভারপুল—লবণের কারখানা। আমাদের দেশের তাঁতীরা হ'ল আঙ্গুলকাটা, আর তাদের দেশে গড়ে উঠল ম্যাঞ্চেষ্টার—কাপড়ের কারখানা। আমাদের দেশে লোহার (কামার)দের যাঁতা বন্ধ হ'ল, আর তাদের দেশে তৈরী হ'ল বাকিংহাম—লোহালক্কড়ের কারখানা।

ইংলণ্ড গরীব দেশ থেকে হ'ল শিল্পপ্রধান দেশ। আর সুখী

বাংলাদেশ রাতারাতি হয়ে পড়ল মড়কে, দুর্ভিক্ষে, নিরানন্দে ম্রিয়মান। বাংলার ভাঙা বুকের উপর তৈরী হল বর্তমান ইংল্যাণ্ড।

ইংরাজবণিকের এই সীমাহীন শোষণের চূড়ান্ত রূপ—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। ইংরাজী ১৭৭০ সাল। বাংলার বুকে নামল দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। সেই মন্বন্তরের নাম শুনলে বাংলার লোক আজও কাঁপে।

একে দু'বছর পর পর অজন্মা। তার উপর দেশের চাল ইংরাজ বণিক আর রেজা খাঁর হাতে। কালোবাজারে চাল বিক্রি করে তারা মোটা আয় করে।

চালের অভাবে বাঙালী মরল। তাতে ইংরাজের কী? তাদের ত টাকা হ'ল। এই ইংরাজ সেদিন বাংলার ভাগ্যবিধাতা—তারা মুখের অন্ন নিয়ে খেলে জুয়া, অন্নহীন লোকদের ঘর ভেঙে খাজনার পয়সা আদায় করে।

বাংলার তিন ভাগের এক ভাগ লোক মরল—ভেঙে পড়ল বাংলার সমাজ। চাষীর হাল গেল, রাখালের গরু গেল, কামারের যাঁতা গেল, তাঁতীর তাঁত গেল···বাঙালীর যা কিছু ছিল গেল সব।

ক্লাইভ পরিচালিত ইংরাজ বণিকদের একটানা সর্বাঙ্গীন শোষণের ভয়াবহ পরিণাম—মন্বন্তরে সোনার বাংলা হ'ল মহাশ্মশান। এই মহাশ্মশানে ইংরাজবণিকদের চালের কালোবাজারের প্রতিবাদে ফাঁসি কাঠে ঝুললেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মহারাজ নন্দকুমার।

প্রথম বাঙালী শহীদের অস্থিতে সেদিন তৈরী হল বাংলার মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার—বজ্র। দধীচির অস্থিতে যেমন একদিন তৈরী হয়েছিল ইন্দ্রের বজ্র—অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

শুধু কি তাই। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার মহাশ্মশানে সেদিন জেগেছিল বারেন্দ্রভূমিতে বিদ্রোহী সশস্ত্র সন্ন্যাসীদের কণ্ঠে তাদের যুগের গান—"বন্দেমাতরম"—যা বাঙালীর মুক্তি সংগ্রামের চিরন্তন আওয়াজ—বন্দেমাতরম।

॥ তিন ॥

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি (৫ই আগষ্ট, ১৭৭৫)

মহারাজ নন্দকুমার—

বণিকরাজ ইংরাজের সীমাহীন শোষণ
ও দুঃশাসনের তীব্র প্রতিবাদ

পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলা দেশে চলে অরাজকতা। প্রধানদের মধ্যে একতা নাই—সিংহাসন নিয়ে হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি। চারিদিকে গোলযোগ। হিংসা, অনৈক্যে সকলে শক্তিহীন। শক্তিমান শুধু ইংরাজ।

বাদশারা দূরদৃষ্টির অভাবে ইংরাজদের দুর্গ গড়বার এবং সৈন্য রাখবার অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই ভুলের ফল দেখা দিল এখন। ইংরাজরা হ'ল দেশের সর্বেসর্বা। দেশের লোক কিছু নয়।

বাংলার নবাবরা ইংরেজদের হাতের কাঠের পুতুল।

নবাবদের দুর্দশা দেখে মীরজাফরের দেওয়ান নন্দকুমার ব্যথিত হলেন। সামান্য অবস্থা থেকে কর্মদক্ষতার গুণে তিনি তখন বাংলার কর্ণধার।

নন্দকুমার মীরজাফরের আমলে ১৭৫৭-৬০ ও ১৭৬৪-৬৫ এবং তৎপুত্র নিজামউদ্দৌলার আমলে ১৭৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত দেওয়ান ছিলেন।

এই শেষোক্ত কালে ক্লাইভ ভারতে প্রত্যাবর্তন করে এবং বাংলার কারিগর ও চাষীদের শোষণ শুরু হয়।

নন্দকুমার দেখলেন, নবাবরা স্বাধীন না হলে এ নির্যাতনের শেষ হবে না।

নবাব তখন মীরজাফরের কিশোর পুত্র নিজাম। মহারাজ নন্দকুমার নবাবের পক্ষে বাদশার সহিত সন্ধি এবং ফরাসি ও মারাঠাদের সাথে সখ্যতা স্থাপন করতে সচেষ্ট হলেন।

ক্লাইভ জানতেন মহারাজ নন্দকুমার কর্মদক্ষ লোক। ক্লাইভ নন্দকুমারের পরামর্শ ছাড়া চলতেন না। এখন তাঁর সন্দেহ হল নন্দকুমার ইংরাজের প্রভুত্ব নষ্ট করতে চান।

তিনি নন্দকুমারকে নজরবন্দী করলেন।

১৭৬৬ সন। নিজামের মৃত্যু হ'ল। নবাব হলেন মণি বেগমের বালক পুত্র সইফউদ্দৌলা।

মণি বেগম কোম্পানির উপর সদয় ছিলেন। কোম্পানির লোকরা তাঁকে মা বলত।

রেজা খাঁ আর সিতাব রায়কে দিয়ে কোম্পানি রাজস্ব আদায় করাত। তারা ইংরাজের দালাল। নবাব সরকারে মহারাজ নন্দ-কুমারের আর প্রতিপত্তি থাকল না। নবাব সরকারে এখন মোড়ল হ'ল ইংরাজ দালালরা।

নন্দকুমারের প্রতিপত্তি খর্ব করে সাগর পারে পাড়ি দিলেন ক্লাইভ।

ক্লাইভের পর লাট হয়ে এলেন ভারলেষ্ট···তারপর কার্টিয়ার। শোষণ, অত্যাচার চলল অব্যাহত।

অত্যাচারিত মানুষ নন্দকুমারের কাছে আসে প্রতিকারের আশায়। তিনি নির্বাক।

ইংরাজের সর্বনাশা রূপ তাঁর চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল। ইংরাজের শুভেচ্ছার উপর তাঁর একদিন ভরসা ছিল। এর জন্য তিনি

একদিন সিরাজের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন। তখন তিনি ছিলেন হুগলীর ফৌজদার।

ইংরাজরা ফরাসীদের আড্ডা চন্দননগর আক্রমণ করল।

নন্দকুমারের উপর সিরাজের আদেশ ছিল—ইংরাজের বিরুদ্ধে ফরাসীদের সাহায্য করবার জন্য কিন্তু তাতে তাঁর মত হয় নি। তিনি ফরাসীদের সহায়তার জন্য নবাবের প্রেরিত সেনানায়ক দুর্লভরামকে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করেন।

নন্দকুমার সিরাজের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন নি। পলাশীর যুদ্ধের পর তিনি ক্লাইভের অনেক সহায়তা করেন এবং তিনি ছিলেন ক্লাইভের প্রধান পরামর্শদাতা।

এখন নন্দকুমার দেখলেন, এ বন্ধুত্বের কি পরিণাম। মীরকাশিম দেখেছেন একদিন। এখন দেখলেন নন্দকুমার।

মীরকাশিম দেশত্যাগী, নন্দকুমার পদচ্যুত।

মণি বেগমের বালক পুত্র সইফের পর নবাব এখন বেগমের বার বছরের ছেলে মবারক। এঁর রাজত্ব কালে এল বণিক-রাজ ইংরাজের নির্যাতনের চূড়ান্ত রূপ—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

পীড়িত জনসাধারণ হ'ল নন্দকুমারের শরণাপন্ন। স্বনাম খ্যাত গৌরী সেন প্রমুখ পরদুঃখকাতর লোকদের নিয়ে তিনি দুর্গতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

দেশে চাল নাই। টাকায় কি হবে আর। চাল সব ইংরাজ বণিক আর রেজা খাঁর হাতে। কালোবাজারে চাল বিক্রি ক'রে মুনাফা করে ইংরাজ বণিক আর তাদের দালালরা।

নন্দকুমার চোখের উপর দেখলেন বিভীষিকা। প্রতিকার? দুই উপায়—অস্ত্রের সাহায্যে ইংরাজ বিতাড়ন অথবা আবেদন নিবেদন করে।

সশস্ত্র বিদ্রোহের ক্ষেত্র বাংলায় ছিল সেদিন। আধিকারচ্যুত জমিদার, জায়গীরহারা দেশী সিপাই, অন্নহারা কারিগর, শোষিত

চাষী, দুর্ভিক্ষে সর্বহারা বাঙালী, এদের সংগঠিত করতে পারলে বাংলার মাটিতে ইংরাজ রাজত্বের কবর খনন করা যাবে।

নন্দকুমার সেদিকে দিয়ে আনাড়ি। সামরিক প্রতিভা ছিল না তাঁর। তাঁর পক্ষে খোলা ছিল আবেদন-নিবেদনের পথ।

বাংলার দুর্ভিক্ষের মর্মস্পর্শী বিবরণ আর তার কারণ যে ইংরাজ বণিকদের সীমাহীন শোষণ, দুর্নীতি আর নির্যাতন এ কথা বিলাতের সাহেবদের জানাবার জন্য নন্দকুমার লণ্ডনে নিজের একজন প্রতিনিধি পাঠালেন।

বাংলার দুর্ভিক্ষের কথা বিলাতে সবিস্তারে প্রচারিত হ'ল। বিলাতে ছড়িয়ে পড়ল কোম্পানির কর্মাচারীদের নির্মম শোষণের কথা। কলঙ্কের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য ক্লাইভ আত্মহত্যা করলেন।

* * *

পার্লামেণ্টে বাঙালীদের জন্য অগ্নিগর্ভ ভাষায় বক্তৃতা দেন মহাত্মা এডমণ্ড বার্ক।

ইংলণ্ডের শাসনকর্তারা নেতাদের কথাও ফেলতে পারেন না, আবার আশু সাম্রাজ্যের আশাও ছাড়তে পারলেন না।

লোক দেখানো মত তাই তাঁরা কলকাতার গবর্ণর বদলি করলেন এবং গবর্ণর করে পাঠালেন ওয়ারেন হেষ্টিংসকে—একজন পাকা ঘুষখোর আর ওস্তাদ শোষককে।

কোম্পানির কেরাণী হয়ে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস বাংলায় আসেন। তারপর কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ (১৭৫৩) এবং কলকাতা কাউন্সিলের সদস্য (১৭৫৯) হন।

১৭৬৪-৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি বিলাতে ছিলেন। এরপর ভারতে আগমণ করেন এবং মাদ্রাজ কাউন্সিলের সদস্য (১৭৬৯) হন। তারপর বাংলার গবর্ণর (১৭৭১) হন।

দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী যারা, তাদের বিচারের ভার পড়ল হেষ্টিংসের উপর।

কাঠগড়ায় উঠল মাত্র দুজন লোক। দুজনই এদেশের লোক—রেজা খাঁ আর সিতাব রায়।

নির্মম শোষণে পটু ইংরাজ সওদাগররা কই?

তারা সাধু।

কাঠগড়ায় রেজা খাঁ আর সিতাব রায়।

বিচারক হেষ্টিংস।

চোরের বিচারক চোর। সুড়ির সাক্ষী মাতাল।

মামলা নিয়ে হেষ্টিংস দেরী করতে লাগলেন।

প্রমাণ সংগ্রহের ভার দিলেন মহারাজ নন্দকুমারের উপর। নন্দকুমার তাড়াতাড়ি যোগাড় করলেন মামলার খুটিনাটি।

ক্লাইভ চালাক লোক। তার চেয়েও বেশী চালাক হেষ্টিংস। দুপাখী—না, এক ঢিলে মারলেন তিন পাখী।

...মহারাজ নন্দকুমার আন্দোলনের নায়ক। তাঁকে শান্ত করবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহের ভার দেওয়া হ'ল তাঁর উপর। উপরন্তু নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাস নবাবের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হলেন।

...আসামী রেজা খাঁ আর সিতাব রায়। চোদ্দ মাস পরে প্রমাণাভাবে আসামীদের মুক্তি হ'ল কিন্তু আসামীদের চাকরি গেল।

তা যাক্। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অবসরে তাদের চোদ্দপুরুষের উদরান্নের ব্যবস্থা হয়েছে।

...কোম্পানী চোর কিন্তু বিচারক সুযোগসন্ধানী।

এই সুযোগে হেষ্টিংস সুবাদারের পদ তুলে নিজের হাতে নিলেন রাজস্ব আদায়ের ভার এবং কোম্পানি মা মণি বেগমকে করলেন বব্বু বেগমের কিশোর পুত্র নবাব মবারকের অভিভাবিকা।

* * *

মহারাজ নন্দকুমার আদর্শবাদী লোক। কোম্পানি আর কর্মচারীদের দুর্নীতি দূর করাই হ'ল তাঁর ব্রত।

১৭৭৩ সাল।

মহারাজ নন্দকুমারের আন্দোলনের ফলে কোম্পানি আর কর্মচারীদের দুর্নীতি দূর করার জন্য পার্লামেণ্টের প্রধান মন্ত্রী নর্থ 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' নামে তৈরি করলেন এক আইন।

এই আইনে হেষ্টিংস হলেন বাংলার লাট এবং ভারতের বড় লাট। নর্থের আইনে বড়লাটের পদ নূতন সৃষ্ট হ'ল। আশু সাম্রাজ্য লাভের সম্ভাবনা ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞদের মনে রূপ নিচ্ছে। এই বড়লাটের কাউন্সিলে চারজন সদস্য নিযুক্ত হলেন।

কোম্পানি আর কোম্পানির কর্মচারীদের সাথে দেশীয় লোকদের বিবাদ মিটাবার জন্য তৈরী হ'ল সুপ্রিমকোর্ট। ইলাইজা ইম্পে প্রধান জজ। আরও তিনজন পিউনি জজ।

নন্দকুমারের আন্দোলনে কোম্পানির চারিদিকে বদনাম রটে। তা দূর করবার জন্য নর্থের এই আইন। উপর থেকে দেখতে ভালো। ভিতরে সব ফাঁপা। সুপ্রিম কোর্ট, কাউন্সিল কিছুই নয়—সবই হেষ্টিংস।

উপরে সভ্য শাসনের ব্যবস্থা, ভিতরে কিন্তু দুর্নীতি আর দুঃশাসনের মহিমা। কোর্ট আর কাউন্সিল দুর্নীতিপরায়নের আড্ডা—আর হেষ্টিংস তার সর্বেসর্বা।...

কোনও একটা জাতির সকলে খারাপ হয় না। ইংরাজদের মধ্যেও ছিল ভাল লোক। সুপ্রিমকোর্টের একজন জজ আর কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন সৎলোক। হেষ্টিংসের উপর তাঁরা ছিলেন অপ্রসন্ন, কারণ হেষ্টিংস ঘুষ খান, অর্থ আত্মসাৎ করেন আর শোষণ করেন।

১৭৭৫ সালের ১১ই মার্চ। নন্দকুমার হেষ্টিংসের কুকার্য বিবৃত করে কাউন্সিলের সৎ সদস্য ফ্রান্সিসকে পত্র দিলেন।

হেষ্টিংস ক্রুদ্ধ হলেন মহারাজ নন্দকুমারের উপর। হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ দায়ের হ'ল সুপ্রিম কোর্টে মহারাজ নন্দকুমারের নামে। এ মামলা টিকল না।

৬ই মে, ১৭৭৫।

মহারাজ নন্দকুমারের বাড়ি ঘেরাও করল কোম্পানির সিপাইরা। বন্দী অবস্থায় নন্দকুমার কারাগারে নীত হলেন।

নিষ্ঠাবান, ধার্মিক, পরদুঃখকাতর নন্দকুমার অপরাধী? সারা কলকাতা হতবাক্।

হেষ্টিংসের কুঠিতে বসল ষড়যন্ত্রের মজলিস। ইংরাজদের হিন্দু মুসলমান দালাল আর হেষ্টিংসে চলল সলা-পরামর্শ। কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য এবং সুপ্রিমকোর্টের অধিকাংশ জজ এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। মিথ্যা মামলা তৈরি হ'ল নন্দকুমারের বিরুদ্ধে। সাক্ষীদের রিহার্সাল চলল।

নন্দকুমারের নামে দলিল জাল করার মামলা উঠল।

মামলা দায়ের করল হেষ্টিংসের পরামর্শে মোহনপ্রসাদ—মৃত বোলাকি দাসের অছি গঙ্গাবিষ্ণু ও হিঙ্গুলালের এটর্নি।

মামলার বিষয়:—

একসময় নন্দকুমার বোলাকি দাসের দোকানে কিছু অলঙ্কার জমা রাখেন কিন্তু পরে খোয়া যায়। বোলাকি তার মূল্য বাবদ নন্দকুমারকে লিখে দেন ৪৮০২১ টাকার তমসুক। বোলাকির মৃত্যুর পর তার নির্দেশ মত কোম্পানির খত বিক্রি করে তমসুকের টাকা নন্দকুমার উশুল করেন এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় দুর্গতদের অন্নসংগ্রহের জন্য ব্যয় করেন। তমসুকের সাক্ষী হিসাবে আবদ কামালউদ্দিন নামক এক ব্যক্তির ছিল মোহরের ছাপ এবং নাম ছিল আবদ কামালউদ্দিন। মোহনপ্রসাদ কামালউদ্দিন খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে হাজির করে বলল—তমশুক্ জাল।

তমশুকে সাক্ষী ছিল আবদ কামালউদ্দিন কিন্তু সুপ্রিমকোর্টে যে সাক্ষ্য দিল তার নাম কামালউদ্দিন খাঁ।

নামের ত্রুটি সম্পর্কে সাক্ষী উত্তর দিল—বর্তমানে ভদ্র হওয়ায়

আবদ কামালউদ্দিন নাম ব্যবহার না করে কামালউদ্দিন খাঁ নাম ব্যবহার করি।

এ আসল লোক নয়। সাজানো লোক। নাম বদলের যুক্তিও দুর্বল। তবুও এই স্বাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হ'ল।

সে বলল—মহারাজ নন্দকুমার যখন মীরজাফরের দেওয়ান তখন আমি তমস্থকে যে মোহরের ছাপ তা কোন কার্যবশতঃ নবাব সরকারে পাঠাই। মহারাজ নন্দকুমার তা ফেরত দেন না। বোলাকি দাসের কোম্পানির টাকা মারবার জন্য তিনি তমস্থকে ঐ মোহর ব্যবহার করেছেন।

এই মিথ্যা এবং ত্রুটিপূর্ণ সাক্ষ্যের সূত্রে নন্দকুমার দোষী সাব্যস্ত হলেন। কারণ জজরা হেষ্টিংসের হাতের লোক—প্রধান জজ ইলাইজা ইম্পে ত বটেই। জালিয়াতির অপরাধে নন্দকুমারের হ'ল ফাঁসির হুকুম। বিচার নয়···বিচারের নামে প্রহসন।

পার্লামেন্টে অগ্নিগর্ভ ভাষায় বার্ক এই বিচারের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। পার্লামেন্টে মহারাজ নন্দকুমারেব ফাঁসি স্থগিত রাখবার প্রস্তাব পাশ হ'ল কিন্তু তার আগেই শয়তান হেষ্টিংসের গোপন ব্যবস্থায় নন্দকুমারের ফাঁসি হয়।

৫ই আগষ্ট ১৭৭৫। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়।

আঁৎকে উঠল সারা কলকাতা। কলকাতার কোন বাড়িতে সেদিন উনুন জ্বলল না।

ব্রহ্মহত্যার পাপে কলকাতা কলুষিত। ফাঁসির দিন কলকাতার লোকরা গঙ্গার ওপারে গিয়ে অন্নগ্রহণ করল। কলুষিত কলকাতায় ফিরল না বহুলোক। ইংরাজের কূটনীতির বীভৎসতা অঘোর ঘুমের মধ্যে বাঙালীর চোখে ভেসে উঠল আচমকা।

ফাঁসির কাঠে ঝুললেন সেদিন প্রথম বাঙালী—মহারাজ নন্দ কুমার।

॥ চার ॥

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৭১—৭৫)

সশস্ত্র বিপ্লবের সূচনা

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিতর দিয়ে মহারাজ নন্দকুমার যখন কোম্পানির শোষণ ও দুর্নীতি বন্ধ করবার চেষ্টা করছিলেন তখন সারা উত্তরবঙ্গে জেগে উঠেছিল এক সশস্ত্র বিপ্লবের ঢেউ।

ইহাই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ (১৭৭১—৭৫)।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মধ্যে এই সশস্ত্র বিপ্লবের সূচনা হয়।

সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের আগেই উত্তরবঙ্গে বিপ্লবের বীজ উপ্ত হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচারে বিপ্লবের সূত্রপাত হয়।

দেবী সিংহ হেষ্টিংস সাহেব ও সরকারী কর্মচারী গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের আজ্ঞাবহ।

সময় মত খাজনা দিতে না পারলে দেবী সিংহের হাতে কারও নিস্তার ছিল না। দেবী সিংহের অত্যাচারে উত্তরবঙ্গের কৃষকরা বিদ্রোহী হয় (১৭৬৫)।

কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কৃষকগণের নেত্রীস্থানীয়া ছিলেন দেবী চৌধুরাণী নাম্নী একজন বীর নারী। তাঁর গুরু ছিলেন ভবানী পাঠক। শোষকের অর্থ লুণ্ঠন করে সেই ধন দরিদ্রকে বিতরণ করা ও অনাথ দুর্বলকে রক্ষা করাই ছিল তাঁদের কাম্য।

লেফটেন্যান্ট ব্রেনান সাহেব দেবী চৌধুরাণীকে ধরবার জন্য সচেষ্ট হন কিন্তু তাঁর অভিযান ব্যর্থ হয়।

দেবী চৌধুরাণীর কাহিনী নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেন তাঁর সুবিখ্যাত উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণী।'

উত্তরবঙ্গের এই কৃষক বিদ্রোহের (১৭৬৫) উর্বর ক্ষেত্রে সৃষ্ট হয় সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়।

অধিকার-চ্যুত জমিদার, জায়গিরহারা দেশী সিপাই, অন্নহারা কারিগর, শোষিত চাষী, দুর্ভিক্ষে সর্বহারা বাঙালীরা সেদিন উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পতাকা তলে সকলে এসে জুটল।

বিদ্রোহীরা সাধারণ মানুষ। এরা থাকত সন্ন্যাসীর বেশে··· সন্ন্যাসীর মত। তাই এই বিদ্রোহকে বলা হয় সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ। তাঁদের কঠোর ব্রত পালন করতে হত। উপাস্য দেবী তাঁদের জননী জন্মভূমি।

নবাব আর কোম্পানির শাসন শেষ করে মাতৃভূমির মুক্তি সাধন করাই তাদের ধর্ম—সন্তান ধর্ম।

রাজসরকার থেকে কলকাতায় যত খাজনা ও ধান যেত সন্ন্যাসীরা তা পথিমধ্যে লুটে নিত? মন্বন্তরের দুর্গত মানুষদের মধ্যে তারা তা বিতরণ করত। অর্থসংগ্রহ, অস্ত্র তৈরী, আর সন্তান পোষণের জন্য তারা ডাকাতি করত—তাদের লক্ষ্য স্বাধীন ভারত।

সন্তান সৈন্যদের হাতে থাকত লাঠি, সড়কি বা দু চারটে বন্দুক। তারা শিবাজির মত গরিলা যুদ্ধ করত। কোম্পানির সিপাইরা যেদিকে থাকত না তারা সেইদিকে অভিযান করে লুটে নিত কোম্পানির রসদ কিন্তু যেই সিপাইদের আসবার খবর পেত অমনি নিরাপদ স্থানে তারা পালিয়ে যেত। কোম্পানির লোকরা তাদের কোন পাত্তা পেত না।

জনসাধারণ সন্তানদের এত ভালবাসত যে তাদের কোন খবর কিছুতেই তারা কোম্পানির লোকদের কাছে প্রকাশ করত না।

কোম্পানির সিপাইদের সাথে সন্তানদের কয়েকবার সম্মুখ সংঘর্ষ বাধে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কোম্পানির সিপাইরা পরাজিত হত।

কোম্পানির সিপাইদের কামান বন্দুক থাকলে কি হবে? সংখ্যায় তারা কম।

হেষ্টিংস কাপ্তেন টমাস নামক একজন সুদক্ষ সেনানায়কের অধীনে একদল সৈন্য বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করেন। সন্তানদের সহিত সংঘর্ষে ইংরাজের অনেক সৈন্যের মৃত্যু হয়। স্বয়ং টমাস ও আর একজন সেনানায়ক সন্তানদের হাতে প্রাণ দিল।

এর পর কাপ্তেন এডওয়ার্ড নামে আর একজন সেনানায়ক এই বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হয়। তার সৈন্যদল সন্তানদের সহিত যুদ্ধে বিধবস্ত হয় এবং নিজেও প্রাণ হারায়।

উত্তরবঙ্গের মাঠ, ঘাট, প্রান্তে সেদিন সন্তান সৈন্যদের জয়ধ্বনিতে মুখরিত। কতবার কত অস্ত্রের আঘাত নিয়ে ফিরে গেল ইংরাজ সেনানায়কগণ।

সন্ন্যাসীবিদ্রোহ এই। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এই বিদ্রোহের উপর ভিত্তি করে লিখেছেন অমর উপন্যাস 'আনন্দ মঠ'। 'আনন্দ মঠ' ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় বাংলায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনী। কাহিনী ঐতিহাসিক।

অতীত সমাজ, গৃহ পরিবেশ, আচার-ব্যবহার, ব্যক্তিমানসের সত্য চিত্র আনন্দ মঠ।

অতীত বঙ্কিমের লেখনীতে নূতন রঙে উদ্ভাসিত। উদ্দেশ্য— জাতীয়তার উদ্বোধন।

শাসক ইংরাজের অনাচার, অবিচার ও দমন-নীতির প্রতিবাদে বাংলায় জাগে জাতীয়তাবোধ। দেশ-মাতৃকার সেবায় ও মুক্তি সাধনায় বাঙালীর দীক্ষাদান 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য।

স্বদেশকর্মীদের কাছে 'আনন্দ মঠ' ছিল 'গীতার' সমান।

* * *

ইংরাজরা ধীরে ধীরে রাজশক্তি হাতে পায়। আসে নূতন, নূতন সৈন্য, বৈজ্ঞানিক রণসজ্জা, কামানের পর কামান।

সন্তান আর কৃষকদের লাঠি, সড়কি হয় ভোঁতা। থেমে যায় বিপ্লবের গান।

নিস্তব্ধ সন্তান দল। নীরব বারেন্দ্র ভূমি।

সেদিন বারেন্দ্র ভূমিতে সেই সন্তানদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল তাদের যুদ্ধের গান 'বন্দেমাতরম'। তা আজ সারা ভারতে হচ্ছে ধ্বনিত—বাংলা মার শিকল ভাঙার সার্থক গান—বন্দেমাতরম্।

॥ পাঁচ ॥

গণবিদ্রোহ

—বাংলার আকাশে খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহের মেঘ।

রাজবিদ্রোহ

ইংরাজের অগ্রগতির প্রধান বাধা দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা হল ইংরাজের মিত্র।

দ্বিতীয় বাধা দেশের কারিগর। তারা হ'ল সর্বহারা। তৃতীয় দেশের মাটির সাথে যাদের সম্বন্ধ—জমিদার ও কৃষক।

কোম্পানি যেদিন রাজস্ব আদায়ের ভার নিল সেদিন এদের উপর আঘাত পড়ল।

আঘাতের প্রত্যুত্তর দিল এরা। এদের হাতেই উঠল বিদ্রোহের ধ্বজা।

নবাব মীরকাশিম নবাবীর বখশিস্ স্বরূপ বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করেন। (১৭৬০)।

এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট বর্ধমানের রাজা তিলকচাঁদ বীরভূমরাজের

সাথে মিলিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কোম্পানির সহিত যুদ্ধে তাঁদের পরাজয় ঘটে।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ধলভূমের রাজা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হন।

প্রজাবিদ্রোহ : চুয়াড় বিদ্রোহ

তখনকার দিনে জমিদাররা ছিলেন প্রায় স্বাধীন রাজার মত। তাঁদের থাকত দুর্গ, সৈন্য। জমিদারের এই সামরিক শক্তি রাখতে দিল না কোম্পানি। এই সামরিক শক্তি নষ্ট করতে তারা সুরু করল।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের অধিকারে আসে মেদিনীপুর।

মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলে জমিদারদের দুর্গ ছিল।

জঙ্গলমহলের অধিবাসী বন্য-কৃষক প্রজা চুয়াড়রা ঐ সব জমিদারদের অধীনে পাইক ও সৈনিকের কার্য করত এবং পুরস্কার স্বরূপ তারা জমিদারদের কাছ থেকে জমি জায়গীর পেত।

······কোম্পানি জায়গীর জমি রাজেয়াপ্ত করল এবং জঙ্গলমহলের দুর্গ ভেঙে ফেলবার হুকুম দিল। ফলে চুয়াড়রা বিদ্রোহী হয়।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ২০০ মাইল্ ব্যাপী জঙ্গলমহলে চুয়াড়দের বিদ্রোহ ঘোষিত হ'ল।

লেঃ ফারগুসান সাহেবকে এই বিদ্রোহ দমন করতে বিশেষ কষ্ট পেতে হয়।

চুয়াড়গণের বিষাক্ত শরে ও ব্যাধিতে অনেক ইংরাজ সৈন্যের প্রাণহানি হয়। এই বিদ্রোহ পুরাপুরি দমন করা যায় নি তখন।

১৭৯৮ সালে চুয়াড়গণ পুনরায় বিদ্রোহী হয়।

মেদিনপুর শহরের নিকটবর্তী আবাসগড় ও কর্ণগড়কে কেন্দ্র করে তারা নানাস্থানে আক্রমণ চালায়।

এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য কোম্পানি কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণিকে বন্দিনী করেন।

চুয়াড়দের সমস্ত আড্ডা ভেঙে দিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়।

এমনি করে বাংলার আকাশে উড়তে লাগল খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহের মেঘ। মেঘ উড়ে যায় আবার জমা হয়। এভাবে চলতে চলতে এল ঝড়—সারা ভারত ব্যাপী মুক্তির আন্দোলন—সিপাহী-বিদ্রোহ।

১৮৫৭ সালের কথা সে।

সে সময়ে আবার প্রজাবিদ্রোহ ঘটে বাংলার ছুদিকে ছুটো—গঙ্গার পূর্বপারে ওয়াহাবি আন্দোলন (১৮৩১) ও নীলবিদ্রোহ (১৮৫৮) এবং গঙ্গার পশ্চিমধারে নায়েক বিদ্রোহ (১৮০৬-১৬) ও সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬)।

॥ ছয় ॥

সংস্কার ও প্রগতির আবেদন

রাজা রামমোহন

বাঙালীর খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ শূন্যে বিলীন হ'ল। নিবিড় ঐক্য আর পাকা সংগঠনের অভাবে সে সব ব্যর্থ হ'ল।

বাঙালীর পরাজয় ও ব্যর্থতা ডেকে আনল সারা ভারতের ছুর্দিন।

শোষিত বাংলার অর্থ আর সম্পদে ইংরাজের দিগ্বিজয় সুরু হয়।

বাংলার মাটি থেকে ইংরাজের আঘাত চলল ভারতের এক একটি প্রদেশের দিকে।

ভারতজয়ের ঘাঁটি হ'ল বাংলা। হেষ্টিংস সুরু করলেন ভারত-জয়ের আয়োজন।

মারাঠা আর মহীশূর তখন ভারতের উদীয়মান ছুটি শক্তি।

পরাজয় হ'ল হেষ্টিংসের। হেষ্টিংসের পরাজয়কে জয়ের গৌরবে মণ্ডিত করলেন ওয়েলেসলি (১৭৯৮)।

ভারতের প্রবল শক্তি তখন মারাঠা। তাদের হাতে সেদিন দিল্লীর সিংহাসন। প্রবল মারাঠাদের ভয়ে দেশীয় রাজারা সন্ত্রস্ত। মাথা পেতে নেয় ওয়েলেসলির অধীনতামূলক সন্ধি (Subsidiary alliance)।

স্বদেশপ্রেমের জ্বলন্ত সূর্য মহীশূরের টিপু সুলতান। ওয়েলেসলীর অধীনতামূলক সন্ধির আমন্ত্রণে তিনি সাড়া দিলেন না।

ইংরাজ সৈন্য তাঁর রাজ্য আক্রমণ করল।

প্রতিবেশী নিজাম ইংরাজের সামন্ত। টিপুর সাহায্যে অগ্রসর হল না নিজাম। মারাঠাদের মধ্যে তখন দলাদলি, সিংহাসন নিয়ে হানাহানি।

একা লড়লেন টিপু। শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গের সামনে তরবারি হাতে ইংরাজের কামানের সাথে লড়তে লড়তে তিনি প্রাণ দিলেন।

ভারত-ইতিহাসের নির্মম শতাব্দীর উপর পড়ল যবনিকা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সুরু।

অর্ধেক ভারতের উপর উড্ডীন গৈরিক পতাকা কম্পমান। চারিদিকে জেগে উঠেছে ইউনিয়নজ্যাকের বিভীষিকা।

শিবাজীর মন্ত্র শূন্যে বিলীন হল। মারাঠার বিপুল শক্তি নিঃশেষ।

মারাঠাদের বিরাট সাম্রাজ্য হ'ল খণ্ড খণ্ড।

মারাঠার পতনের সাথে ভারতের স্বাধীনতার সকল সম্ভাবনা হ'ল অস্তমিত।

ছলে বলে কৌশলে ইংরাজ ধীরে ধীরে কুক্ষিগত করতে লাগল একটা একটা করে দেশীয় রাজ্য—রাজপুতানা, আসাম, আরাকান, সিন্ধু, পাঞ্জাব।

ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদের খোরাক যোগাত উদ্বাস্ত বাংলা।

চারিদিকে আর্তনাদ, লাঞ্ছনা, অমানুষদের কোলাহল। ভারতবাসী আশাহীন, ভরসাহীন, আত্মহারা।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় মহারাজ নন্দকুমার দুর্নীতি দমন ও অন্যায় অবিচারের অবসানের আবেদন তুলে শোষিত মানুষদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন যেমন একদিন, তেমনি আজ ইংরাজের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার দিনে ঐক্য ও সংগঠনের অভাবে পরাজিত বাঙালীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য আর একজন বাঙালী ব্রাহ্মণের কণ্ঠে উঠল সংস্কার ও প্রগতির বাণী।

তিনি রাজা রামমোহন।

রাজা রামমোহন

১৮১৪ সাল।

নূতন ধর্ম ও কর্মের বাণী নিয়ে কলকাতায় এলেন রামমোহন। শিক্ষা ও সংস্কারের ভিতর দিয়ে জাতিকে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে হবে এই হ'ল তাঁর পণ।

ইউরোপে তখন শিল্পবিপ্লব। ফলে সেখানে আজ তিনটি শ্রেণী—ধনী, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক। সেখানকার দেশে দেশে আজ লড়াই—সাগর পারের এই সংগ্রাম ও স্বাধীনতার স্পৃহা বিশ্বে আনল এক নূতন অনুপ্রেরণা। এই অনুপ্রেরণা যাতে আমাদের দেশে আসে এই হ'ল তাঁর কাম্য।

ইউরোপের এই জাগরণের বাহন হ'ল ইরাজী ভাষা। তিনি ছিলেন তাই ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী।

তাঁর চেষ্টায় স্থাপিত হ'ল ইংরাজী স্কুল আর কলেজ।

রাজা রামমোহনের প্রগতি আন্দোলনের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হ'ল বাংলা সংবাদপত্র···চারিদিক থেকে সুরু হ'ল নব চেতনার উদ্বোধন।

···মায়ের কোল থেকে ছেলে কেড়ে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের জলে ফেলে

দেওয়া হ'ত সেদিন আমাদের এই অভাগা দেশে। জ্যান্ত মানুষকে বলি দেওয়া হ'ত দেবতার সামনে সেদিন। মরা স্বামীর চিতায় জোর করে মেয়েদের পোড়ান হত।

আরও কত কি কুসংস্কার।

উদার হিন্দুধর্মের সে কি শোচনীয় পরিণাম। হাজার ঠাকুরের পূজা অর্চনা—যাগ যজ্ঞই শুধু সার। সমাজেও জাত-অজাতের প্রশ্ন। নির্মম নির্যাতন শূদ্রের উপর।

রামমোহনের চেষ্টায় উঠে গেল ধর্মের নামে নরহত্যা।

রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মমত এই বিকৃত হিন্দুধর্মের যুগোপযোগী সংস্করণ—সাম্য, জাতীয়তা ও মুক্তির পথ।

নূতন ধর্মমত আনল কুসংস্কারের উপর আঘাত। বসল মেয়ে-পুরুষের কলেজ।

রামমোহনের প্রস্তাবে রাজপুরুষরা ও শিক্ষিত ইংরাজরা সুশাসন প্রবর্তনে পক্ষপাতী হ'ল।

সুরু হয় ইংরাজের শৃঙ্খলার শাসন। ধীরে ধীরে বসে শহর, আদালত, হাসপাতাল, রাস্তা, রেল, ডাক, তার। ভারত লাভ করল এক শাসন।

রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মমত প্রচারের ভিতর দিয়ে এল সর্বভারতীয় আন্দোলনের জোয়ার।

মুক্তির ভবিষ্যৎ ফুটে উঠেছিল রামমোহনের দূরদৃষ্টির সামনে। ভারতের এক অন্ধকার ক্ষণে তিনি রচনা করলেন জাতীয়তাবোধের ভিত্তি।

রামমোহনের সৃষ্টি নূতন ধর্মমত, নূতন সংস্কার, নূতন শিক্ষা—সাম্য, স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের মন্ত্র।

সুদূর মুক্তির ভূমিকায় সমাজের উচ্চস্তরে যখন এই গঠনমূলক আন্দোলন চলছিল তখন ভাঙনের ডাক উঠেছে অন্যত্র।

ইংরাজের শক্ত দুয়ারে পড়ল আবার আঘাত—আঘাতের পর আঘাত। সে সব রামমোহনের পরবর্তী বিদ্রোহের কথা।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আর বিদ্রোহের মধ্যে জন্ম রাজা রামমোহনের—আর নায়েক বিদ্রোহের পর ওয়াহাবি আন্দোলনের মধ্যে রামমোহনের বিদায়।

রামমোহনের ধর্ম ও কর্ম সাধনার আবেদন সেদিন ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে বাইরে সর্বত্র।

॥ সাত ॥

নায়েক বিদ্রোহ (১৮০৬—১৬)

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে নায়েক নামক এক বন্য জাতি মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে বিদ্রোহী হয়। বগড়ির রাজ-সরকারে এরা সৈনিকের কাজ করত। রাজার প্রদত্ত জায়গীর জমি এরা পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করত। কিন্তু কোম্পানি বগড়ির রাজা ছত্রসিংহকে রাজ্যচ্যুত করে এবং নায়কদের জমি বাজেয়াপ্ত করে। ফলে নায়েকেরা বিদ্রোহী হয়। বিদ্রোহীদের নেতার নাম অচল সিংহ।

নায়েকদের সহিত বহুদিন ধরে বৃটিশ সৈন্যের খণ্ডযুদ্ধ হয়।

বৃটিশ সৈন্যরা প্রথমে ব্যর্থ হয়। পরে বহু কামান একত্রে দেগে তাদের আড্ডা ধ্বংস করা হয়। বহু নায়েক সৈন্য প্রাণত্যাগ করে এবং কোম্পানির হস্তে বন্দী হয়।

অচল সিং একদল নায়ক-সৈন্য নিয়ে বর্গীদের দলে যোগদান করে এবং বৃটিশ-অধিকৃত স্থান সমূহ আক্রমণ করে।

কোম্পানির সৈন্যরা প্রতিরোধ করতে পারে না।

বগড়ির রাজ্যচ্যুত রাজা ছত্রসিংহের সহায়তায় অবশেষে অচল সিং ধরা পড়ে।

নায়েকগণ ছোট ছোট দলপতির অধীনে আরও কিছুদিন ইংরাজদের বিরুদ্ধাচরণ করে। ১৮১৬ সালে তারা একেবারে পরাজিত হয়। প্রায় দু'শ নায়েক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়। সতরজন দলপতির প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসি হয়।

আমরা আজ কত শহীদকে স্মরণ করি কিন্তু ভুলে গেছি এদের কথা। সেদিনকার সেই বিদ্রোহী বন্য জাতি—চুয়াড়, নায়েক, ডোম, বাগ্‌দি, দুলে, হাঁড়ি—আজ সমাজে অস্পৃশ্য। গ্রামের বাইরে পর্ণকুটিরে অবহেলিতভাবে তারা বাস করে। তারা ভূমিহারা, অন্নহারা …অন্যের ক্ষেত্রদাস। চিরকাল তাদের অবস্থা এরকম ছিল না।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের হাতে এরা ভূমিচ্যুত, অথচ থাকল না তাদের কোন অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা। তাই তাদের অবস্থা এই রকম।

তারা ইংরেজের সাথে লড়েছে, তারা ইংরাজের ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছে। তারা ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদের বলি।

তারা অপাংক্তেয় নয়। তারা একদিন বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল—তারা বিদ্রোহী, শহীদ। আমরা ভুলতে পারি না সে কথা।

॥ আট ॥

ওয়াহাবি আন্দোলন (১৮৩১)

—ইংরাজ উৎখাতের আর একটি আন্দোলন।

আরবের মরুপ্রান্তরে এই আন্দোলনের জন্ম।

ভারতের মাটিতে এই আন্দোলন নিয়ে আসেন রায়-বেরিলির সৈয়দ আহমদ।

ওয়াহাবি আন্দোলনের মর্মকথা হ'ল বিকৃত ইসলাম ধর্মের সংস্কার।

আরবে প্রথম যখন ইসলামধর্মের আবির্ভাব ঘটে তখন তার যে রূপ ছিল পরবর্তীকালে ধর্মান্তরিত নানান দেশের নানান জাতির মিশ্রিত প্রভাবে তার রূপ হয় অন্য রকম—আরবের মাটির ধর্মে আরব জাতীয়তার স্বাদ থাকে না আর। ওয়াহাবি নামক আরবের এক ধর্মপ্রাণ দেশ-প্রেমিক ব্যক্তি ইসলামধর্ম সংস্কারের জন্য শুরু করেন এই আন্দোলন।

বিকৃত হিন্দুধর্ম সংস্কারের জন্য রাজা রামমোহনের পশ্চাতে যেমন একদল নিষ্ঠাবান, আদর্শবাদী যুবক কর্মক্ষেত্রে নেমেছিল—তেমনি বিকৃত ইসলাম ধর্মের সংস্কারের জন্য রায় বেরিলির সৈয়দ আহমদের পশ্চাতে নেমেছিল একদল নিষ্ঠাবান, আদর্শবাদী মুসলমান।

প্রথম দলের কর্মপন্থা ছিল ইংরাজ উৎখাতের আন্দোলন।

বাংলায় এই আন্দোলন প্রসারের জন্য ১৮২১ খৃষ্টাব্দে আসেন সৈয়দ আহমদ।

বাংলায় তাঁর প্রধান শিষ্য হলেন তিতুমীর।

তিতুমীর চব্বিশ পরগণার এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঘরের সন্তান। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা। এই পেশার জন্য তিনি নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতেন। শেষে ওয়াহাবি আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

কলকাতা আর চব্বিশ পরগণায় ছিল তাঁর কর্মকেন্দ্র।

গুপ্তকেন্দ্র থেকে তিনি এই আন্দোলন পরিচালনা করতেন।

তিতুমীরের সঙ্ঘ-শক্তিতে ইংরাজরা ভয়াতুর হয়।

ইংরাজ ও তিতুমীরে সংঘর্ষ আসন্ন হয়।

ইংরাজদের মিত্র শিখদের সহিত সংঘর্ষে সীমান্তে মারা যান সৈয়দ আহমদ।

ইংরাজী ১৮৩১ সাল সেদিন। সেই সময় সুদক্ষ একদল ইংরাজ সৈন্য তিতুমীরকে আক্রমণ করল। তিতুমীরও তাঁর গুপ্তকেন্দ্র থেকে ইংরাজ সৈন্যদের বাধা দেবার জন্য অগ্রসর হলেন।

উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়—১৪ই নভেম্বর আর ১৭ই নভেম্বর দুদিন। ইংরাজ সৈন্য পরাজিত হল এবং কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করল।

এরপর তিতুমীরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হ'ল বিরাট একদল সৈন্য। পরাজিত হয়ে তিতুমীর তাঁর জন্মভূমি গোবরডাঙার নিকটবর্তী তেঁতুলিয়া গ্রামে 'বাঁশের কেল্লা' নির্মাণ করেন। এই আশ্রয় থেকে তিনি প্রবল ভাবে ইংরাজ সৈন্যদের বাধা দিলেন।

তিতুমীরের সৈন্যদের হাতে লাঠি, তীর-ধনুক, বর্শা-বল্লম আর ইংরাজ সৈন্যদের হাতে কামান, বন্দুক, রাইফেল। তিতুমীরের জয় হয়। পিছু হুঁটে যায় ইংরাজ সৈন্য।

কিন্তু বিধাতা ইংরাজদের প্রতি সদয় হলেন। উঠল প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা। ঝড়ে উড়ে গেল বাঁশের কেল্লা।

ইংরাজের জয় হ'ল।

তিতুমীর হলেন নিহত।

বাংলার এক বিদ্রোহী নেতার জীবন ইংরাজের সহিত যুদ্ধে সেদিন এমনি করে শেষ হ'ল।

॥ নয় ॥

—পরাধীনতার প্রতিবাদে বন্যর বিদ্রোহ

সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬)

তিতুমীরের নেতৃত্বে রাজ্যহারা মুসলমানদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়।

বৃটিশ-শাসন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়। বসল শহর, আদালত, হাসপাতাল, রেল, তার, ডাক।

সাঁওতাল পরগণার পাশ দিয়ে চলল রেল। দুর্ভেদ্য সাঁওতাল পরগণার পাহাড় ও জঙ্গলের ভিতর লুব্ধ বণিকরাজ ইংরাজের দালাল দেশী জমিদার, মহাজন বেনিয়ার শোষণ আরম্ভ হল।

সাঁওতাল বন্য জাতি। সভ্যতার বর্বর লোভ তাদের কাছে অসহনীয়। স্বাধীন চেতা এই সাঁওতালরা—দাসত্বের প্রতিবাদ করে। নির্যাতীত হয়ে বিদ্রোহ করে।

কলকাতার সন্নিকট নারায়ণপুরের জমিদার ইংরাজের দালাল। শোষণ লোভে সাঁওতাল পরগণায় সে ব্যবসা পাতল।

অকথ্য নির্যাতনের সম্মুখীন হ'ল সাঁওতাল জাতি। নির্যাতন যখন হয়ে উঠল সীমাহীন তখন দলে দলে সাঁওতাল তীর ধনুক নিয়ে কলকাতার দিকে অগ্রসর হয়।

নারায়ণপুরের জমিদার বাড়ি আক্রান্ত হ'ল। জমিদার নিহত হয়। দালালদের রক্ষার জন্য ছুটল ইংরাজ সৈন্য। সাঁওতালদের সঙ্গে ইংরাজ সৈন্যের বাঁধল সংঘর্ষ। ইংরাজের কামানের গোলার সামনে তীর ধনুক হাতে যুদ্ধ করল সাঁওতালরা। ইংরাজের সহিত যুদ্ধে সাঁওতালরা প্রাণ দিল।

পাহাড়ের ছায়ায় শাল আর মহুয়ার বনানী ঘেরা শস্য শ্যামল প্রকৃতির কোলে সাঁওতালরা মানুষ। স্বভাবতঃ তাই তারা সরল ও স্বাধীনচেতা। তাদের সহজ, স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রার মাঝখানে অমা-রাত্রির অন্ধকারের বিভীষিকার মত হাজির হ'ল ইংরাজ শাসন—শাসনের নামে শোষণ।...শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের বনজঙ্গল কেটে জঙ্গলী জায়গাকে সম্পদশালিনী করেছিল সাঁওতালরা কিন্তু শাসনের নামে তাদের আয়ে ভাগ বসাতে লাগল সরকারী আমলারা। বিপর্যস্ত সাঁওতালরা নিপীড়নে নিপীড়নে হয়ে উঠল বেপরোয়া। বন্য সাঁওতালরা হ'ল সংগ্রামী।

সাঁওতাল পরগণার রাজধানী বারহাইট-এর উপকণ্ঠে ভাগনাদিহি গ্রাম। সাঁওতালদের নেতা সীদু ও কালু দুই ভাই এই গ্রামে বাস করত। সীদু ও কালুর বিশ্বস্ত অনুচর ছিল চাঁদ ও ভৈরব নামক অপর দুই ভ্রাতা। সীদুর প্রাণে বাজল সরকারের অন্যায় নিপীড়ন। ভাই ও বিশ্বস্ত অনুচরদ্বয়কে নিয়ে সাঁওতালদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে লাগল

সে। আসন্ন বিদ্রোহ সম্বন্ধে তারা সমগ্র সাঁওতাল সম্প্রদায়কে সজাগ করে তুলল। ইংরাজদের কুঠি ও রেল লাইনের উপর সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ হ'ল তাদের পরিকল্পনা।

সাঁওতালদের অস্ত্র ছিল তীরধনুক, কুঠার, তলোয়ার আর সামান্য কয়েকটা বন্দুক। সীত্থ, কালু ও চাঁদ, ভৈরবের প্রাণান্ত পরিশ্রমে সাঁওতালরা হ'ল সঙ্ঘবদ্ধ ও সশস্ত্র। এমন সময় গ্রামে গ্রামে সাঁওতালদের কাছে এল আসন্ন বিদ্রোহের নেতা সীত্থর বার্তা :

তোমাদের কাছে এই এক টুকরো কাগজ যাচ্ছে :

ভগবান আমাকে স্বপ্ন দিয়েছেন আর এরকম বহুৎ কাগজ পাঠিয়েছেন : মনে রেখো, ভাই···

এ কাগজ ভগবানের আশীর্বাদ। ভয় নেই! নির্ভয় হও। আমাদের পিছনে আছেন ভগবান। ফিরিঙ্গি আমরা তাড়াবোই। শাল গাছের ডাল গেলেই ঘর পিছু একজন করে আমার বাড়িতে হাজির হবে। ভুলো না।

ইংরাজী ১৮৫৫ সনের ৩০শে জুন সীত্থর বাড়িতে বসল সভা। পূর্বাহ্ণে সাঁওতালদের ঘরে ঘরে গেল শালগাছের ড্াল। সীত্থর বাড়িতে এল দলে দলে সাঁওতাল। দশহাজার সাঁওতালের জমায়েত নিল মরণপণ সংগ্রামের দুর্জয় সঙ্কল্প।

···মাত্র এক সপ্তাহ। এক সপ্তাহ পরই সাঁওতালদের নিঝুম দেশ ভরে জ্বলে উঠল আগুন। ৭ই জুলাই থানার দারোগা একদল পুলিশ নিয়ে এল ভাগনাদিহি গ্রামে—সেদিনকার জমায়েত সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেবার জন্য।

সাঁওতালদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধল। সীত্থর হাতে দারোগা নিহত হ'ল। ন'জন পুলিশ সাঁওতালদের হাতে প্রাণ দিল। অন্যান্য পুলিশরা পালিয়ে গেল।

বিদ্রোহ সুরু হ'ল···

রাণীগঞ্জে মোতায়েন হ'ল সরকারী সৈন্য। ১৬ই জুলাই তারিখে সরকারী সৈন্যদের সাথে সাঁওতালদের প্রবল সংঘর্ষ হ'ল। সাঁওতালরা জয়ী হ'ল।

অনবরত চলে সাঁওতাল আর সরকারী সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ।

* * * *

একদিকে বন্দুক, রাইফেল, গুলিগোলা, বারুদ···অপর দিকে তীর ধনুক, কুঠার, তলোয়ার। পৃথিবীর অন্যতম পরাক্রান্ত সামরিক শক্তি একদিকে, আর অপর দিকে চির অবহেলিত নিঃস্ব দুঃস্থ ভারতের আদিম অধিবাসী জাতি। সাঁওতালদের দুর্দিন এল। ডাক, তার, রেলের জন্য সরকারী সৈন্যদের মধ্যে বেশ যোগাযোগ ছিল। আর যোগাযোগের অভাবে সাঁওতালরা হয়ে পড়ল বিচ্ছিন্ন। এবার সুরু হয় পরাজয়ের পালা।

* * * *

পরাজয়ের পর পরাজয়ে তারা বনজঙ্গলে আশ্রয় নিল।··· সভ্যতা-গর্বী জাতি যখন বর্বরতার আশ্রয় নেয় তখন সে বর্বরতা হয় ভয়াবহ। নভেম্বরে সাঁওতালদের সমস্ত এলাকায় সামরিক আইন জারি হ'ল।

সাঁওতালদের অধ্যুষিত অঞ্চল হ'ল আইন বহির্ভূত অঞ্চল।

এর বেশীর ভাগ জায়গা ছিল আগে বাংলার অন্তর্গত। এর পর ইহা বিহার প্রদেশের ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বাঙালী ও সাঁওতালের বসবাসই এখানে বেশী। বাংলার রাঢ় অঞ্চলে এখনও অনেক সাঁওতালের বাস। অধিকাংশ সাঁওতাল বাংলাভাষাভাষী। ফলে সাঁওতালদের আমরা স্বচ্ছন্দে বাংলার লোক বলতে পারি।

সামরিক আইনের কবলে পড়ল সাঁওতাল জাতি। বিনা আইনে

বে-আইনী ভাবে সাঁওতালদের উপর সুরু হ'ল দমননীতি। একদিকে নির্মম অত্যাচার, অপর দিকে অর্থের প্রলোভন।

নিপীড়নে দিশেহারা বহু সাঁওতাল আত্ম-সমর্পণ করল। বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে ভাগলপুরের সরকারী সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ল সীহু।

*　　*　　*　　*

বৃটিশের কারাগারে সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সীহু বন্দী হ'ল। আরও দশহাজার অনুচর কারা-প্রাচীরের অন্তরালে ফাঁসির দিন গুণতে লাগল।

বাইরে তখনও স্থানে স্থানে চলে খণ্ডযুদ্ধ।

ফাঁসির রজ্জুর বিভীষিকা নামে সাঁওতালদের চোখের উপর। কামানের ধোঁয়ায় থেমে যায় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন।

১৮৫৬ সালে শীতের শেষাশেষি বিদ্রোহের ডঙ্কা থেমে যায় সর্বত্র। হিমশীতল প্রাণে প্রাণে কায়েম হ'ল পরাধীনতা।

শাল-অর্জুনের ডালে ডালে ফাঁসির দড়িতে দোদুল্যমান দশহাজার বিদ্রোহী সাঁওতাল আর তাদের নেতা সীহুর শব কাঁপে বসন্তের প্রথম হাওয়ায়।

মহুয়ার বনের ছায়ায় আচম্‌কা থেমে যায় মাদল আর উতাল নাচের তাল।

॥ দশ ॥

সিপাহীবিদ্রোহ : ১৮৫৭

—প্রথম সর্বভারতীয় জাতীয় সংগ্রাম

আসে বিদ্রোহ। বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ :

বাংলার আগুন ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে।

আসে বিদ্রোহ।

বিদ্রোহ আসে কেন? কারণ ভারতের উপর বৃটিশের চরম আঘাত। তাসের ঘরের মত খসে যায় ভারতের সমাজ ব্যবস্থা।

রাজা বাদশাদের গেল রাজ্য। অনেক রাজ্য ইংরাজ কেড়ে নেয় ছলে-বলে—বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মহীশূর, হায়দারাবাদ, মারাঠা রাজ্য এবং আসাম, আরাকান, রাজপুতানা, সিন্ধু আর শিখের রাজ্য।

অনেক রাজ্য ইংরাজ বিশ্বাসঘাতকতা করে বাজেয়াপ্ত করল—নানা সাহেবের রাজ্য, ঝাঁসির রাণীর ঝাঁসি আর অযোধ্যা। নিঃসন্তান জমিদারদের দত্তক গ্রহণে আপত্তি দ্বারা অনেক সম্পত্তি ইংরাজ দখল করল।

*   *   *   *

ঐ সব জমি ইংরাজরা বিলি করল তাঁবেদারদের মধ্যে—দেশের চাষী মজুরদের শোষণে যারা ইংরাজের সাথে হাত মিলাল তাদের।

বর্তমান কালের বড় বড় জমিদারবংশ—এরাই আমাদের শোষণ করেছে, আমাদের মানুষ হতে দেয় নি। এরাই বিলাস ব্যসনে অধঃপতনের পথে নেমেছে···আমাদেরও অধঃপতিত করেছে।

স্বাধীনতার পরও এর খুব পরিবর্তন হয়নি। জমিদারীপ্রথা উঠল কিন্তু ক্ষতিপূরণের টাকায় পুরানো জমিদার হ'ল শিল্পের মালিক, ব্যবসার মালিক, আরও অনেক কিছু। একেই বলে পাপীর স্বর্গ—যারা দেশের স্বাধীনতা লাভে বিশ্বাসঘাতকতা করল, দেশবাসীর যারা সর্বনাশ করল তাদের এক যুগের পর আর এক যুগ সুখভোগের ব্যবস্থা হ'ল আর যারা দেশকে ভালবাসল তাদের হরিনাম জপ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকল না।

* * * *

সেদিন অধিকারচ্যুত রাজরাজড়াদের আক্রোশ আর নির্যাতিত প্রজাদের আর্তনাদ এক হ'ল।

এর সঙ্গে মিশল দেশীয় সিপাইদের অসন্তোষ।

দেশীয় সিপাইদের জন্য ইংরাজের এত বড় রাজ্য অথচ ইংরাজদের অধীনে তাদের অবস্থা হ'ল রীতিমত খারাপ।

দেশীয় সিপাইদের বেতন কম কিন্তু গোরা সৈন্যদের বেতন বেশী। বড় বড় পদ গোরাসৈন্যের। দেশীয় সিপাইদের কৃতিত্ব যতই হোক না কেন তাদের চল্‌তে হ'ত গোরা সিপাইদের হুকুম মত। দেশী সিপাইদের মান গেল।

সিপাইরা বেশীর ভাগ অযোধ্যা প্রদেশের লোক। বিশ্বাস-ঘাতকতা করে ইংরাজ দখল করল অযোধ্যা। সিপাইরা ইংরাজদের উপর বিশ্বাস হারাল।

দেশীয় সিপাইদের মধ্যে সুরু হ'ল খৃষ্টানধর্ম প্রচার। এর পর গরু ও শূকরের চর্বি দেওয়া এনফিল্ড কার্তুজ দাঁতে করে কাটবার হুকুম হল। সিপাইরা মনে করল হয়ত তাদের জাতধর্ম দুই-ই গেল।

অধিকারচ্যুত রাজরাজড়ারা—নির্যাতিত জনসাধারণ—অসন্তুষ্ট সিপাই। সকলের মন চায় কিছু করার জন্য। সকলের মন বিদ্রোহের দিকে। ভারতের বুক থেকে ইংরাজদের তাড়াবার জন্য সকলের প্রাণ দৃঢ়সঙ্কল্প।

সুযোগও ছিল তখন। ভারতে তখন ছিল চল্লিশ হাজার গোরা সৈন্য। তার প্রায় বার আনা তখন পাঞ্জাব আর ব্রহ্মে। কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত ফাঁকা মাঠ—গোরা সৈন্য সেখানে অনুপস্থিত, শুধু দেশীয় সৈন্য। দেশের লোকের হাতে ছিল তখন অস্ত্র।

সুযোগ হাজির। সঙ্কল্প অটুট। ভারতের শিরায় শিরায় নাচছে তখন বিদ্রোহের রক্ত। ভারতব্যাপী সুরু হয় এক বিরাট বিদ্রোহের পরিকল্পনা।

চলে বিদ্রোহের আয়োজন ও প্রস্তুতি। একই দিনে সুরু হবে সর্বত্র বিদ্রোহ। বিদ্রোহের কাজ ইংরাজ হত্যা, ইংরাজের ঘাঁটি, দুর্গ দখল আর ইংরাজের সকল শক্তি নিঃশেষে ধ্বংস।

বিদ্রোহের আয়োজন ও পরিচালনা করলেন মারাঠা রাজকুমার নানাসাহেব, ফৈজাবাদের মৌলবী আহম্মদ শা, মারাঠাবীর তাঁতিয়া তোপে, রাজপুতবীর কুমার সিংহ, অসম সাহসিকা ঝাঁসির রাণী।

এঁদের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হল দেশীয় সিপাই আর জনসাধারণ।

বিদ্রোহের প্রথম অবলম্বন হ'ল সিপাইরা, আর তাদের সহায়ক হল' দেশের জনসাধারণ। এই সিপাইরা প্রথম সুরু করল এই বিদ্রোহ।

দেশী সিপাই সেদিন সংখ্যায় ছিল ২০ লক্ষ ১৫ হাজার। কিছু দেশী সৈন্য ইংরাজের অনুগত থাকল।

দাক্ষিণাত্যে সৈন্যরা বিদ্রোহে যোগ দিল না। বিদ্রোহ সেখানে তাই প্রবল হয় নি।

উত্তর ভারতেই বিদ্রোহ হ'ল প্রবলতম। কিছু অন্ত্যজ হিন্দু আর শিখরা বাদে সকলে যোগ দিয়েছিল জাতির এই জীবন-মরণ সংগ্রামে। বিদ্রোহের ডাকে সর্বপ্রথম সাড়া দিল বেঙ্গল আর্মি। বাংলার গৌরব এই বেঙ্গল আর্মি।

পলাশীর যুদ্ধের একশ' বছর পর—১৮৫৭ সাল।

পালাশীর আম্রকাননের প্রেতাত্মারা চীৎকার করে উঠল সেদিন একবার—

ভাবিয়াছ বুঝি শুধিবে না কেহ
উৎপীড়নের দেনা।

বিদ্রোহের আগুন তাই প্রথম সুরু হ'ল পলাশীর অনতিদূরে বহরমপুরে। বিদ্রোহীদের অস্ত্রহীন করা হল। স্তব্ধ হয় বহরমপুরের বিদ্রোহ।

বারাকপুরে ছিল ৪৭ নং ফৌজ। এই ফৌজের মঙ্গল পাণ্ডে নামক সিপাই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিদ্রোহের প্রথম গুলি ছোড়েন। তাই ইংরাজরা বিদ্রোহীদের বলত পাণ্ডিয়া।

মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে সিপাইরা নিহত করল গোরা অফিসারদের, টেলিগ্রামের তার কাটল। রাজপথে ছুটল সিপাইরা—কণ্ঠে বিদ্রোহের জয়গান।

অবিলম্বে তারা ধৃত হয়।

রাজপথে গাছের ডালে তাদের ফাঁসি হয়।

সিপাইদের ক্ষুদ্র বিদ্রোহ এর আগে আরও দুবার ঘটে। ভিলোরে ১৮০৬ সালে আর বারাকপুরে ১৮২৪ সালে।

বারাকপুরের সিপাইরা বর্মার বিরুদ্ধে যেতে অস্বীকার করে এবং বিদ্রোহী হয়। নির্মম হস্তে ইংরাজরা সে বিদ্রোহ দমন করে।

মেদিনীপুরস্থ রাজপুত জাতীয় সিপাই দলের পল্টনদের বিগড়াবার চেষ্টা করেন একজন তেওয়ারি ব্রাহ্মণ। কর্ণেল ফষ্টর এই দলের নায়ক উক্ত তেওয়ারি ব্রাহ্মণকে বন্দী করেন এবং স্কুলের সম্মুখে কেল্লার মাঠে তাঁর ফাঁসি হয়।

কর্ণেল সাহেবের একজন পত্নী ছিল রাজপুত রমণী। তার চেষ্টায় বিদ্রোহ বন্ধ হয়।

বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে বাংলার জেলায় জেলায় সেনাদলের ছাউনিতে। চট্টগ্রাম সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত ছিল ৩৪ সংখ্যক পদাতিক সৈন্যের তৃতীয় ও চতুর্থ দল।

১৮ই নভেম্বর রাত্রি এগারটার সময় ঐ সিপাইরা বিদ্রোহী হয়ে খুলে দিল জেলখানা। তারা রাজকোষ লুণ্ঠন করল।

গোলা-গুলি সহ তারা উত্তর দিকে চলে যায় পার্বত্য ত্রিপুরার অভ্যন্তরে। কারামুক্ত কয়েদী ও স্ত্রীপুত্র সহ তারা সংখ্যায় ছিল প্রায় পাঁচশত। সিপাইদের ধরবার জন্য ৭৫৲ টাকা করে পুরস্কার ঘোষিত হ'ল। তারা ধরা পড়ল। চট্টগ্রামে তাদের ফাঁসি হয়।

বিদ্রোহের আগুন ছড়ায় বাংলার সর্বত্র।

বাংলার সকল জায়গায় বিদ্রোহ সুরু হ'ল।

রাণীগঞ্জ তখন রেলপথের শেষ। বিদ্রোহীরা রাণীগঞ্জ আক্রমণ করল, রেলপথ ধ্বংস করল।

দিকে দিকে চলল' বিদ্রোহের জয়গান। বাংলা থেকে বিদ্রোহ উত্তর ও মধ্য ভারতের দিকে অগ্রসর হয়।

বাংলায়ই প্রথম সিপাইবিদ্রোহ আরম্ভ হয়।

বাংলার বিদ্রোহ শুধু মাত্র সিপাইদের বিদ্রোহ। এতে জনসাধারণের বিশেষ সমর্থন ছিল না। এই জন্য ইহা জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের আকার ধারণ করতে পারল না, যেমন—করেছিল উত্তর ও মধ্য ভারতে।

বাংলার সিপাই বিদ্রোহ তাই সত্বর দমিত হ'ল।

বাংলার সিপাই বিদ্রোহ হ'ল শুধু সিপাইদের বিদ্রোহ। জনসাধারণের মুক্তির সংগ্রামে এর পরিণতি হ'ল না।

কারণ কি ?

ইংরাজের সর্বশক্তির কেন্দ্র ছিল কলকাতা। বাংলার উপরে তাই ছিল তার সজাগ দৃষ্টি।

বাংলার চাষীদের হাত থেকে তখন জমি কেড়ে নিয়েছে কোম্পানি।

কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে চাষী ও তার জমি তখন জমিদারের অধীন। এই নূতন তৈরি জমিদারশ্রেণী কায়েমি স্বার্থের জন্য ইংরাজের সাহায্য করল, আর প্রজাদের অধীন রাখল। জমিদার ত এগোলই না···প্রজারাও এগোতে পারল না সিপাইদের পাশে।

বুদ্ধিজীবিরা অর্থাৎ রাজা রামমোহনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সাথীরা ইংরাজী সভ্যতা, ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজের সংস্পর্শে ভারতের জাতীয় জাগরণের স্বপ্ন দেখছিলেন। তাদের চিন্তাধারায় এই বিদ্রোহ ছিল সেই জাগরণের প্রতিকূল।

শূন্যে মিলিয়ে গেল তাই মুষ্টিমেয় কিছু সিপাইদের অস্ত্রাঘাত।

বাঙালীর শিয়রে তখন চলছে মুক্তির উল্লাস······

জীবনের জয়গান। শিকল ছিড়বার ঝন্ ঝন্ আওয়াজ!

* * * *

ইংরাজ-শোণিতে মধ্য ও উত্তর ভারতের মাটি পিছল। ইংরাজের ঘাঁটি, দুর্গ ধুলায় পরিণত। সমগ্র মধ্য ভারত থেকে বৃটিশ শাসন উবে গেল কর্পূরের মত। বিদ্রোহী সৈন্য ও জনসাধারণের অধিকারে এল ভারতের রাজধানী দিল্লী। বিদ্রোহীরা দিল্লীর সিংহাসনে বসাল—দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাকে।

সম্রাট বন্ধ করলেন গো-কোরবানি। বিদ্রোহান্তে মুক্ত ভারতের শাসনভার রাজন্যমণ্ডলীর হাতে অর্পণ করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। জমিদার ও প্রজার মিলনে এবং হিন্দু ও মুসলমানের সম্প্রীতিতে পত্তন হ'ল নূতন সরকার।

জলপথে বিদ্রোহীদের আধিপত্য ছিল না। ইংরাজের ছিল আধিপত্য।

এই পথে আসতে লাগল বিলাত থেকে ইংরাজ সৈন্য আর আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র।

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সুরু হ'ল ইংরাজের পাল্টা অভিযান।

বিদ্রোহীদের হাত থেকে খসে পড়ল শহরের পর শহর। প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য বিদ্রোহীরা বুকের রক্ত দিয়ে সংগ্রাম করল। ইংরাজ তাঁবেদার দেশীয় লোকদের বিশ্বাসঘাতকতায়, ইংরাজের বিপুল রণ-সম্ভার ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের কাছে, নিজেদের অপ্রতুল সামরিক সাজ-সজ্জার জন্য ও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে বিদ্রোহীদের পরাজয় হ'ল।

নানা সাহেব পালিয়ে গেলেন নেপালের বনে। তাঁতিয়া তোপে ধরা পড়ে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিলেন। বাহাদুর শা রেঙ্গুনে নির্বাসিত হলেন। বীর বালা ঝাঁসির রাণী সম্মুখ সমরে নিহত হলেন।

ইংরাজরা আবার ফিরে পেল রাজ্য। প্রতিশোধের স্পৃহায় তাদের হাতে জ্বলল নির্মম অমানুষিকতার আগুন। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, পুরুষ নির্বিচারে গুলি করে তারা হত্যা করল। লুণ্ঠন, হত্যায় ভারতবাসীদের উপর তারা নিল প্রতিশোধ। ভারতের সর্বপ্রান্তে উঠল হাহাকার।

শেষ হ'ল সিপাহী বিদ্রোহ।

ভারতের চোখের সামনে জেগে থাকল জঘন্য অমানুষিকতার বিভীষিকা।

সে স্মৃতি কোনদিন ভুলবে না ভারতের লোক।

পরাধীন ভারতের শিয়রে শহীদদের রক্তসাগর।
তারি তরঙ্গে জাগে মুক্তির গান।

॥ এগার ॥

নীল বিদ্রোহ

—বাংলার চাষী আর মধ্যবিত্তের মিলিত সংগ্রাম ও সংগ্রামশীল জাতীয়তাবোধের আবির্ভাব ঃ

উত্তর ও মধ্য ভারতের দিকে দিকে বাজে বিদ্রোহের ডঙ্কা কিন্তু বাংলার মানুষদের এ বিদ্রোহে দান নগণ্য। বাংলায় শুধু মাত্র কয়েকজন পশ্চিমা সিপাই বাংলায় বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

বাংলার লোক এ আন্দোলনে যোগ দিল না, কারণ বাংলার নেতারা বিদ্রোহের রূপ দেখে চঞ্চল ও ভীত হলেন। তাঁরা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে মগ্ন থাকলেন। বিদ্রোহ নয়…সুশাসনের দাবী হ'ল তাঁদের আদর্শ। নেতৃত্বের অভাবে বাংলার জনসাধারণ সেদিন হ'ল নির্বাক, অলস।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে বাংলার চাষী আর মধ্যবিত্ত ইংরাজশাসনের উপর বীতশ্রদ্ধ। সংগ্রামের জন্য তাদের হাতের মুঠি কাঁপছে থরথর করে। সুদূর উত্তরাপথের শবাকীর্ণ রক্তাক্ত রাজপথ থেকে ভেসে আসে বীর নায়কদের রোমাঞ্চকর সংগ্রাম কাহিনী—তাঁতিয়া তোপে, নানাসাহেব, ঝাঁসির রাণী, বাহাদুর শা'র কাহিনী। শোষিত, নির্যাতিত বাংলার কৃষকদের রক্তেও নাচন লাগে কিন্তু রক্তে রাঙা সংগ্রামের পথ কে দেখাবে তাদের?

নিরাপদ পথ বেছে নিয়েছেন নেতারা। বাংলার কৃষকদের বিপ্লবের সাথে সংযোগ ছিল না। তাই বাংলার সিপাই বিদ্রোহের করুণ ব্যর্থতার পরিহাসের মধ্যে বিধাতার আশীর্বাদের মত এল জাতীয়তা বোধ, আর সংগ্রাম বাংলার বিদ্রোহ নীল-বিদ্রোহের মধ্যে।

ভারতের সিপাইবিদ্রোহের ব্যর্থতা ঘুচাল বাংলার নীলবিদ্রোহ। বাংলা তথা ভারতে এল সংগ্রামশীল জাতীয়তাবোধের এক ভাবের বন্যা।

নীল বিদ্রোহের মধ্যে সেই ভাবের সুরু আর বঙ্গভঙ্গের মধ্যে তার পূর্ণ প্রকাশ।

* * * *

নীরব রক্তে-রাঙা সংগ্রাম।

বারাকপুর থেকে দিল্লি পর্যন্ত রাজপথ স্তব্ধ।

গোরা সিপাইদের উদ্যত অগ্নিনালিকার সামনে বিদ্রোহী ভারত ঘুমোতে বাধ্য হ'ল। বালুচরে, প্রান্তরে, উপত্যকায়, মরুর বুকে সেদিন যে অঘোর ঘুম এল,—কাদের কণ্ঠস্বরে সে তন্দ্রার বুক চিরে জাগল মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তীব্র অশনির আলোর মত?

বাংলার নীলচাষীর সে কণ্ঠ।

সেই কাহিনী নীলবিদ্রোহের কাহিনী। এই কাহিনীর মূল নীলরঙ। নীলরঙ অতি প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে তৈরি হ'ত এবং দেশ-দেশান্তরে রপ্তানি হ'ত।

ইংরাজ আমলের প্রথম ভাগে এ দেশে আসে আমেরিকা থেকে নীল উৎপাদনের নূতন প্রণালী। পাশ্চাত্য বণিকদের কারসাজিতে বাংলার বস্ত্র ব্যবসায়, লবণ ব্যবসায় প্রভৃতি শিল্পবাণিজ্য যেমন বাঙালীর হাত থেকে ইংরাজদের একচেটিয়া অধিকারে চলে গেল তেমন তাদের হাতে চলে যায় বাঙালীর নীল রঙের ব্যবসা। বাংলার চাষী হ'ল শুধু উৎপাদনের মালিক,—লাভের মালিক ইংরাজ বণিক।

ইংরাজবণিকরা গ্রামে গ্রামে নীলকুঠি খোলে। নীলের উৎপাদনও খুব বাড়ল। সারা পৃথিবীর প্রয়োজনীয় নীল বাংলা থেকে সরবরাহ হয়। তার মধ্যে যশোহর, খুলনা, নদীয়ায় নীল চাষ হয় বেশী। যশোহর, খুলনা, নদীয়ায় ঘটে নীল বিদ্রোহ।

নীলব্যবসায়ী ইংরাজ বণিকদের বলা হ'ত নীলকর সাহেব। তারা জমিদারদের কাছ থেকে তালুক পত্তনি নিত এবং তালুকস্থ রায়তদের নিয়ে নীল চাষ করাত।

রায়তরা দাদন নিয়ে নিজ নিজ জমিতে নীল বুনতে চুক্তি করত। দাদনের নগদ পয়সার উপর চাষীদের প্রথম প্রথম লোভ ছিল। নগদ পয়সার মুখ তারা দেখতে পেত না কোনদিন। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে তাদের সুখেই দিন কেটে যেত।

এখন নগদ পয়সার লোভে নীল চাষ করতে ছুটল চাষীরা। নীল চাষীদের প্রথম প্রথম অবস্থা কিছু উন্নত হ'ল কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই সুরু হ'ল তাদের অসীম দুর্গতি।

নীলকর সাহেবদের মধ্যে প্রথম প্রথম পরস্পর একতা ছিল না। তখন তারা বায়তদের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দিত কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের ব্যবসা যেমন স্থায়ী হল তাদের মধ্যে এল একতা। নীলকর সাহেবদের গঠিত হল' সমিতি। তারা বড় বড় তালুক কিনে মালিক হ'ল।

* * *

উন্নতির পর উন্নতিতে নীলকর সাহেবদের মাথা ঘুরে যায়। প্রতিষ্ঠা ও আধিপত্যের জন্য তারা মত্ত হ'ল। বাঙালীর উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সুরু হয়। দেশীয় জমিদারের মধ্যে যারা তালুক পত্তন অথবা বিক্রয়ের জন্য রাজি হ'ত না তাদের ছলে বলে কৌশলে সাহেবরা ভিটেমাটি ছাড়া করত। প্রজারাও নীল চাষ করবার জন্য দাদন নিতে অস্বীকৃত হলে নির্যাতিত হ'ত।

আদালতে রায়ত জোতদারদের অভিযোগের বিচার হ'ত না কিন্তু নীলকর সাহেবদের মিথ্যা অভিযোগ এলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা হ'ত। কারণ বিচারকরা সাহেব, নীলকরদের জাতভাই।

গ্রাম্য লোকদের অসন্তোষ বাড়ে ধিঁকি ধিঁকি।

চাষী আর মধ্যবিত্তদের কেটে যায় নগদ টাকার মোহ।

মধ্যবিত্ত আর জোতদাররা তালুক বিক্রি করতে বা পত্তনি দিতে অরাজি হল।

রায়তরা দেখল সব ফাঁকিজুকি। এত খেটে তারা পায় চার আনা কিন্তু মোটেই না খেটে নীলকর সাহেবরা পায় বার আনা। এত অল্প লাভ যে দাদনের টাকাই শোধ হয় না। তার উপর জুয়াচুরি—সাদা কাগজে টিপ বা সই। দাদন দশ টাকা দিয়ে নীলকররা লিখে রাখত একশ টাকা। লাভ ত দূরের কথা। দাদনের টাকা শোধ করতে সারা বছর হাঁড়ভাঙা খাটুনি খেটেও চাষীদের সর্বস্বান্ত হ'তে হ'ত।

চাষীরা বলল—আমরা আর নীলচাষ করব না।

* * *

সুরু হয় বাংলার চাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার। সরকারী কর্মচারীরা, এমন কি খোদ লাট হ্যালিডে সাহেব নীলকরদের সহায়ক হলেন।

নীলপ্রধান জেলায় নীলকর সাহেবদের সহকারী অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করতে লাগলেন হ্যালিডে সাহেব। অত্যাচার ষোলকলায় পূর্ণ হ'ল।

∴অবাধ্য রায়তদের ঘরবাড়ি জ্বালায় নীলকরদের পাইক-বরকন্দাজ ও আমিন-নায়েব। কুঠির গোপন কক্ষে কয়েদখানা। রায়তরা সেখানে কয়েদ থাকত, অনেক সময় কয়েদীরা গুমখুন হ'ত।

সাহেবরা জানত বাড়ির মেয়েদের অপমান করলে বাঙালীরা বড় জব্দ হয়। তাই অবাধ্য প্রজাদের সায়েস্তা করবার জন্য বাড়ির মেয়েদের অপমান করা হ'ত।

এমনকি মেয়েদেরও কুঠিতে কয়েদ রাখা হত।

এক এক কুঠিতে আবার থাকত রামকান্ত বা শ্যামচাঁদ নামক লগুড়। এই লগুড়ের আঘাতে প্রজারা জর্জরিত হ'ত। মধ্যবিত্ত জোতদারদেরও নিস্কৃতি ছিল না।......

* * *

নীলচাষীদের উপর অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে পরলোকগত সাহিত্যিক দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নামক পুস্তক রচনা করেন। এর ইংরাজী অনুবাদ করেন কবিবর মাইকেল। পাদরি লঙ সাহেব তা প্রকাশ করেন।

এজন্য লঙ সাহেবের কারাদণ্ড হয়।

নীলদর্পণের সংক্ষিপ্ত কাহিনী :—

স্বরপুর গ্রামের প্রজাবৎসল জমিদার গোলোকচন্দ্র বসু। তাঁর দুই পুত্র নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব। গোলোকচন্দ্র বসুর ছিল অনেক খাস জমি। খাস জমিতে ধান হ'ত কিন্তু নীলকর সাহেবদের চাপে সেই সব জমিতে তিনি নীল বুনতে বাধ্য হলেন। নীল চাষে ক্ষতি হতে থাকায় তিনি গ্রামের অন্যান্য কৃষকদের মত জমিতে নীল বুনতে অসম্মত হলেন।

নীলকর সাহেব তাঁর ষাট বিঘা জমির নীলের দাম দিল না,—বলল ; নতুন দাদন না নিলে বকেয়া দাম দেওয়া হবে না।

গোলোক বসু ও তাঁর পুত্র নবীনমাধব বাকি দাম না দিলে নীল বুনতে রাজি হলেন না। নীলকর সাহেব বসুদের শাস্তি দিবার জন্য তাঁদের পুকুর পাড়ে নীল চাষ করালেন। বাড়ির মেয়েদের পুকুরে আসা বন্ধ হ'ল।

গ্রামের চাষী সাধুচরণ সহ রাইচরণ চিহ্নিত জমিতে নীল বুনতে অস্বীকৃত হ'ল। কুঠির আমিন লাঠিয়াল নিয়ে তাদের বাড়ি চড়াও হ'ল এবং তাদের কুঠিতে ধরে এনে আটক করল। পর দুঃখকাতর নবীনমাধব তাদের মুক্তির জন্য কুঠিয়াল সাহেবের কাছে ধর্ণা দিলেন। কিন্তু কোন ফল হল না—উপরন্তু নবীনমাধব অপমানিত হলেন। সাধুচরণ ও তার ভাই উপায়হীন। দাদন নিয়ে, চুক্তিপত্রে সই করে ঘরে ফিরতে বাধ্য হ'ল।

কুঠিয়ালদের রাগ হ'ল বসুদের উপর। গোলোক বসুর বিরুদ্ধে তারা ফৌজদারি মামলা দায়ের করল। মিথ্যা অভিযোগ—গোলোকবাবু নাকি প্রজাদের নীলচাষ করতে বারণ করছেন। বৃদ্ধ সম্মানীয় ভদ্রলোকের হায়রানিতে গ্রামের লোক স্তম্ভিত হ'ল।···

···কুঠির ছোট সাহেবের হুকুমে লাঠিয়ালরা সাধুর মেয়ে ক্ষান্তমণিকে কুঠিতে নিয়ে যায়। ক্ষান্ত তখন গর্ভবতী। সাহেবের বুটের লাথিতে ক্ষান্ত অজ্ঞান হয়।

সাধুর বিপদের খবর পেয়ে নবীনমাধব গ্রামের বিখ্যাত লাঠিয়াল তোরাপকে সঙ্গে নিয়ে ছোট সাহেবের কামরায় প্রবেশ করলেন। সাহেবকে এক লাথিতে অজ্ঞান করে ফেলে ক্ষান্তকে নিয়ে পালালেন নবীনমাধব।

কুঠিয়াল সাহেব আরও গরম হয় বসুদের উপর।

বিচারে গোলোক বসুর জেল হ'ল। জেলে তিনি আত্মহত্যা করলেন।

পিতৃশ্রাদ্ধের পর নবীনমাধব দেশত্যাগের সঙ্কল্প করলেন। এই কটা দিন পুকুর পাড়ে নীল বোনা বন্ধ করবার জন্য নবীনমাধব সাহেবকে অনুরোধ করলেন।

সাহেব রোষভরে নবীনমাধবকে বুটের লাথি মারল। নবীন ঝাঁপিয়ে পড়লেন সাহেবের উপর।

সাহেবের লোক নবীনমাধবের মাথায় লাঠি মারল। নবীনমাধব জ্ঞানশূন্য অবস্থায় মাটির উপর লুটিয়ে পড়লেন।

তাঁর দেহ কোলে করে তোরাপ ঘরে পালিয়ে এল। নবীন মাধবের এই আঘাতেই মৃত্যু হ'ল।

ক্রোধোন্মত্ত চাষীরা তখন ছুটল লাঠি সড়কি নিয়ে নীল কুঠির দিকে।

সেদিন এমনি অবর্ণনীয় অত্যাচার হ'ত।

* * * *

অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় চাষীরা বিদ্রোহ করল। চাষীরা বন্ধ করল নীলচাষ। পাইক বরকন্দাজ গ্রামে গ্রামে হামলা করে। গ্রামের লোক লাঠি ধরল। বাঁধল সংগ্রাম।

কপোতাক্ষী নদী।

পাড়ে চৌগাছা গ্রাম। চৌগাছা থেকে অপর পাড়ে মহেশপুর গ্রাম পর্যন্ত প্রায় আট মাইল পথ। এই পথে কুঠির পর কুঠি।

কুঠিগুলো কাটগড়া কানসার্ণের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলে নীল চাষীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার হয়। বিদ্রোহও প্রথম সুরু হ'ল এইখানে। বিদ্রোহের নেতা চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস।

এঁরা প্রথমে ছিলেন নীলকুঠির দেওয়ান। প্রজাদের দুঃখ দেখে কেঁদে উঠে তাঁদের প্রাণ। অত্যাচারীর দাসত্ব ত্যাগ করে প্রজাদের পাশে গিয়ে তাঁরা দাঁড়ালেন।

তাঁদের আন্দোলনে কাটগড়া কানসার্ণের প্রজারা নীলচাষ বন্ধ করল।

প্রজাদের বিরুদ্ধে সাহেবরা আনল চুক্তি ভঙ্গের মামলা। অনেক প্রজার হ'ল কারাদণ্ড। বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর সারাজীবনের উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে প্রজাদের পক্ষে মামলা লড়লেন, বন্দী প্রজাদের সংসার চালালেন।

প্রজাদের জোট ও মনোবল ভাঙবার জন্য সাহেবদের পাইক-লাঠিয়াল, থানার পুলিশ চাষীদের গ্রাম ঘেরাও করত।

বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টায় বড় বড় লাঠিয়ালের নেতৃত্বে গ্রামের লোকরাও একতাবদ্ধ হ'ল। লড়াই সুরু করল।

অত্যাচারের, বিরুদ্ধে গ্রাম্য চাষীর প্রবল সংগ্রামের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতময়। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবির প্রাণে উদ্দীপনা আনল সে সব কাহিনী।

বর্তমান 'অমৃত বাজার পত্রিকার' প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা শিশির

কুমার ঘোষ তখন তরুণ যুবক। তিনি ছিলেন ঐ অঞ্চলের অধিবাসী। বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়ের মত তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রজাদের সংগ্রামে।

কলকাতার হরিশ্চন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজে প্রজার সংগ্রাম কাহিনী প্রচার করতে থাকেন।

প্রজাদের আন্দোলনের পশ্চাতেও তিনি পরিশ্রম করতেন। সাহেবরা তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করে। মামলা চলবার সময় অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ক্ষয়রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে বাংলার গ্রাম হতে গ্রামান্তরে।

ওয়াহাবি আন্দোলনের অন্যতম নেতা মালদহের রফিক উত্তর বঙ্গে চাষীদের নীলচাষ বন্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

নদীয়ায় চুয়াডাঙ্গা মহকুমার বিদ্রোহের নেতা ছিলেন চণ্ডীপুরের জমিদার শ্রীহরি রায়। খুলনার নেতা বারুইখালির রহিমউল্যা লড়াই-এ প্রাণ দেন।

• • • •

পৃথিবীর ইতিহাসে যত রকম প্রজাবিদ্রোহের কাহিনী আমরা জানি তার মধ্যে বাংলার নীলবিদ্রোহই বিখ্যাত। আর সেই বিদ্রোহে বাঙালী কৃষকের একতা, সামর্থ, দেশপ্রেম ও সংগ্রাম আমাদের চমৎকৃত করে। নীল বিদ্রোহই আমাদের হৃদয়ের সুপ্ত চেতনাকে মুক্তির কামনায় জাগিয়ে দিয়ে গেছে।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

ইংরাজের সাম্রাজ্য জয়ের অভিযানে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুপ্রবেশ এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও নবযুগের সূচনা

॥ এক ॥

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আবাহন

রাজা রামমোহন

আড়াই শত বৎসর ব্যাপী বৈষ্ণব পদাবলী'র মাধ্যমে প্রেম-সাধনা প্রচারে মানুষের মনে বিতৃষ্ণা দেখা দেয়।

দীর্ঘদিন তুর্কী ও মোগলের পরাধীনতায় বাঙালীর প্রগতির পথ রুদ্ধ ছিল—বাঙালীর মন ছিল প্রথা-শাসিত ও দৈব নির্ভরশীল। মুসলমান শাসনের হ'ল অবসান—এল ইংরাজ শাসক আর ইংরাজী ভাষা।

ইউরোপে তখন নবজাগরণের দিন। সেখানকার দেশে দেশে চলেছে তখন স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের লড়াই। মরণোন্মুখ জাতিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করবার পণ করলেন রাজা রামমোহন।

বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আবাহনে তিনি অগ্রণী হলেন।

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এই মহাপুরুষের ব্রাহ্মধর্ম-মত আনল সর্বভারতীয় আন্দোলনের জোয়ার, রচনা করল জাতীয়তাবোধের ভিত্তি।

নব্যবঙ্গের স্রষ্টা রাজা রামমোহনের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসীম ব্যক্তিত্ব। এর ফলে তিনি বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারে সমর্থ হন এবং কুসংস্কারের পথ থেকে বাঙালী জাতিকে উদ্ধার করেন।

এ ছাড়া তিনি ছিলেন বাংলা গদ্যের এবং বাংলা সংবাদপত্রের অন্যতম প্রবর্তক।

তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। তাঁর বাণী অনুধাবন করতে হলে তাঁর জীবনী অনুশীলন করা দরকার। এরপর তাঁর জীবন……

মোগল সাম্রাজ্যের তখন শেষদশা। বাদশাদের তোষামোদ করে যে ইংরাজ বণিকদল এদেশে বাণিজ্য করবার অধিকার লাভ করল শাসকদের জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতার সুযোগে তারাই তখন প্রবল হ'ল। বাংলার তখন তারা ভাগ্যবিধাতা। ভারতের অপরাপর প্রদেশেও তাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত। নবাব, রাজা, উজীর, ওমরাহের সাথে জনসাধারণও ইংরাজের গোলামীর খাঁড়ার তলায় ঘাড় পাততে লাগল।

দেশকে যাঁরা ভালবাসত, দেশের স্বাধীনতাকে যাঁরা ভালবাসত—মোহনলাল, মীরমদন, সিরাজ, মীরকাসিম দেশের জন্য প্রাণ দিল।

কাপুরুষ স্বার্থবাদীর দল রাজকোষ নিঃস্ব করে, চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা করে কিনল ইংরাজের গোলামী। ইংরাজ বণিকরা রাজকোষ থেকে, খেতখামার থেকে, বাংলার মাটি থেকে দুহাতে লুঠতে লাগল অর্থ।

তারই প্রতিক্রিয়া হ'ল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—বাংলার তিন ভাগের একভাগ লোক অনাহারে প্রাণ দিল।

আর শোষিত বাংলার অর্থে, লুণ্ঠিত বাঙালীর রক্তে গড়ে উঠল

শ্রেষ্ঠ নগর লণ্ডন, শ্রেষ্ঠ শিল্পকেন্দ্র ইংল্যাণ্ডের কারখানা শহর লিভারপুল, ম্যাঞ্চেষ্টার, বার্কিংহাম। লিভারপুলের লবণের তলায় বাঙালীর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস থেমে গেল। ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতের শব্দে বাঙালীর আত্মা বন্দী হ'ল। বার্কিংহামের লোহালক্কড়ের অন্তরালে বাঙালীর ভাষা হ'ল মূক। শোষিত, লুণ্ঠিত, হৃতসর্বস্ব বাংলা অনাহারে, মড়কে, গোলামীতে, কলুষতায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে হ'ল আত্মহারা। এই আত্মহারা বাঙালীর ভাষা দিলেন, আশা দিলেন, ভরসা দিলেন—নূতন জীবনের পথ দেখালেন রামমোহন।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ ঘটে—আর ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগর থানায় রাধানগর গ্রামে।

পলাশীর যুদ্ধের ১৭ বছর পর রাজা রামমোহনের জন্ম। মাত্র চার বৎসর চিয়াত্তরের মন্বন্তরের দুঃস্বপ্ন নেমেছে বাংলার বুক থেকে। মন্বন্তরে উজাড় বাংলা তখনও অরণ্যসদৃশ আর ইংরাজ বণিকের শোষণে ও লুণ্ঠনে উদ্বাস্তু বাঙালীরা তখন অনাহারে অন্নের জন্য ঘুরে বেড়ায়।

বাঙালীর সেই অর্তনাদ, লাঞ্ছনা ও অমানুষদের কোলাহলের মধ্যে রাজা রামমোহনের আবির্ভাব।

শিশুকালে রামমোহন পাঠশালায় মাতৃভাষার সাথে মৌলভীর নিকট পার্শি ভাষা শিক্ষা করেন। পাটনায় গিয়ে তিনি আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

তথায় মুসলমান ছাত্রসমাজের সংস্পর্শে থেকে ও মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান ও অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করে তিনি একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হলেন এবং নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনায় আগ্রহশীল হলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বার বৎসর।

প্রচলিত ধর্মের প্রতি অনাস্থায় তাঁর পিতা রাধানগরের জমিদার

রামকান্ত রায় তাঁর প্রতি বিরক্ত হলেন এবং হিন্দুধর্মের মর্ম আয়ত্ত করাবার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তাঁকে কাশীতে প্রেরণ করেন।

রামমোহন ছিলেন মেধাবী ও প্রতিভাবান বালক। তিনি সেই অল্পবয়সে বেদ শাস্ত্রে আশ্চর্যরূপ জ্ঞান অর্জন করেন।

হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে তাঁর প্রতীতি জন্মাল যে মূল হিন্দুধর্মই খাঁটি একেশ্বরবাদের প্রবর্তক। প্রচলিত হিন্দুধর্ম বিকৃতির ফলে নানা দেবপূজায় ও হোমার্চনায় পর্যবসিত হয়েছে।

তিনি প্রচার করলেন যে বৈদিক হিন্দুধর্মই উৎকৃষ্ট ধর্ম। এই ধর্মের উপাস্য দেবতা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিরাকার এবং 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' —ইহাই বৈদিক হিন্দুধর্মের আসল কথা।

রামমোহন এক নূতন ধর্মমত প্রচার করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল। তাঁর প্রচারিত ধর্মমতের নাম ব্রাহ্মধর্ম।

ইহা হিন্দুধর্মের প্রতিকূল বা বিরুদ্ধ নয়। হিন্দুধর্মের ইহা সংস্কৃত সংস্করণ মাত্র।

তৎকালীন গোঁড়া হিন্দুরা তাঁকে হিন্দুধর্ম-বিরোধী ম্লেচ্ছ বলে মনে করতেন।

রামমোহন কিন্তু নিজেকে হিন্দু বলেই জ্ঞান করতেন। তাঁর মতাবলম্বীগণও নিজেদের হিন্দুছাড়া অন্য কিছু মনে করতেন না বা আজও করেন না। বস্তুতঃ ব্রাহ্মধর্মমত হিন্দুধর্মের সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা।

রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মসংস্কারের এই বৈপ্লবিক অভিযান তাঁর মাতা-পিতা, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব, প্রভৃতি কারও মনঃপূত হয় নি। প্রচলিত বিধির বিরুদ্ধে যাঁরা দণ্ডায়মান হন তাঁদের ভাগ্যে এই পুরস্কার জোটে।

বাড়ি থেকে তিনি বিতাড়িত হলেন। বিপ্লবের পথ চিরদিনই কণ্টকাকীর্ণ।

মাত্র ষোল বছর বয়সের কিশোরের পক্ষে এ এক অভাবনীয়

কৃতিত্ব। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে তিনি ইতিমধ্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহম্মদ, যীশু প্রভৃতি নব ধর্ম-প্রবর্তকের নাম আমরা শুনেছি কিন্তু অতি অল্পবয়সী কিশোর ধর্ম-প্রচারকের নাম আমরা শুনি নি। বিপ্লবের কণ্টকাকীর্ণ পথে ষোল বছরের কিশোর বালকের অভিযান অভিনব।

গৃহবিতাড়িত রামমোহন চললেন তিব্বত দেশের অভিমুখে। আজকাল গমনাগমনের সবিশেষ উন্নতি ঘটলেও তিব্বত দেশে গমন আজও দুঃসাধ্য।

আজ থেকে দেড়শ' বছর আগে তিব্বতে যাওয়া ছিল ভয়ানক দুঃসাধ্য কিন্তু বাঙালী কিশোরের কাছে কিছুই অসাধ্য নয়। যে পথে বজ্রযোগিনীর সুসন্তান আচার্য দীপঙ্কর অজ্ঞতার মরুভূমিতে জ্ঞান-বারি সিঞ্চন করতে চলেছিলেন একদিন, সেই পথে চললেন আর এক বাঙালী কিশোর রামমোহন কুসংস্কারের অন্ধকার সংস্কারের বর্তিকা হাতে। রামকান্ত রায় পুত্রকে ফিরাবার জন্য উত্তরাঞ্চলে লোক প্রেরণ করলেন।

চারি বৎসর কাল পর সেই লোকের সঙ্গে রামমোহন ফিরলেন দেশে। এই সময়ের মধ্যে তিনি বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। রামমোহন রায়ের বয়স তখন বিংশতি বৎসর।

বাংলাদেশে তখনও চলছে ইংরাজ বণিকদের শোষণ...শাসন সুরু হয় নি। ইংরাজী স্কুল, কলেজ, রেলপথ, ভাল রাস্তাঘাট কিছুই তখনও স্থাপিত হয়নি।

বিদেশীর শাসন রামমোহনের মোটেই ভাল লাগছিল না। এই শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেন। পরে দেশে ফিরে তিনি অনুধাবন করলেন—শিক্ষা ও সংস্কারের ভিতর দিয়ে জাতিকে জাগাতে হবে এবং বাঙালীর বর্তমান পরনির্ভরতার মায়া ঘুচিয়ে গোলামীর অবসানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। তাঁর

দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ হ'ল সংস্কারের দিকে, বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের আমূল পরিবর্তনের দিকে।

ধর্ম সম্বন্ধে বৈপ্লবিক মনোভাব পরিত্যাগ না করায় তিনি পুনরায় পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যাক্ত হলেন। এই সময়ে তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা শুরু করলেন এবং সরকারী চাকুরী পাবার জন্য সচেষ্ট হলেন।

তখনকার দিনে বড় বড় সরকারী চাকুরী বাঙালীর ভাগ্যে জুটত না। তিনি রংপুরের কালেক্‌টর ডিগবী সাহেবের অধীনে সামান্য কেরানীর পদ গ্রহণ করেন। কর্মদক্ষতার গুণে তিনি দেওয়ানি পদ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ করসংগ্রহ বিষয়ে প্রধান দেশীয় কর্মচারীরূপে নিযুক্ত হন।

এই সময়ের মধ্যে তিনি ইংরাজী ভাষায় বিশেষ সুপণ্ডিত হন এবং অনেক ইংরাজের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব জন্মে। ১৮০০ সাল থেকে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত তিনি সরকারী কাজ করেন। ১৮১৪ সালে তিনি কলকাতায় আসেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সংস্কার-কার্যে ব্রতী থাকেন।

১৮১৪ থেকে ১৮১৬ সাল বাঙালীর প্রথম চেতনার সময়। সেই চেতনার মূলে মানবদরদী কয়েকজন খৃষ্টান পাদরি থাকলেও বাঙালী হিসাবে রামমোহনের নাম অগ্রগণ্য।

কলকাতায় এসে রামমোহন 'আত্মীয় সভা' নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে এবং তর্কবিতর্ক ও লেখার ভিতর দিয়ে বিরোধীদের মতামত খণ্ডন করতে থাকেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্যে হিন্দুধর্মের একেশ্বরবাদের মূল শাস্ত্র বেদান্ত ও উপনিষদ স্বীয় টীকা সহ প্রকাশ করলেন এবং বহুল প্রচারের জন্য হিন্দুস্থানী ও ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশ করলেন।

পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে বাদানুবাদের মধ্য দিয়েই লেখায় বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রচলন হয়।

এক কথায় রামমোহন বাংলা গভ্য সাহিত্যের প্রবর্তক। তার পূর্বে গদ্যে লেখার-রীতি প্রচলিত ছিল না।

রামমোহন ছিলেন ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী। এই সময়ে ইংরাজ রাজপুরুষরা দেশীয় লোকের শিক্ষার জন্য একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করতে উদ্যোগী হন।

তদানীন্তন শাসনকর্তা লর্ড আমহার্স্টকে সংস্কৃত কলেজের পরিবর্তে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করতঃ নানাবিধ বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। তারই ফলে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। রামমোহন স্বয়ং একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

ধর্মসংস্কার ও যুগোপযোগী শিক্ষা বিস্তারের এই সব আন্দোলনের মধ্যে বাংলা সংবাদপত্র ভূমিষ্ঠ হ'ল।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য নামক একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ 'বেঙ্গল গেজেট' নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায় ইহাই প্রথম সংবাদপত্র। এরই পরে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারিগণের প্রচেষ্টায় 'সমাচার দর্পণ' নামক একখানি বাংলা সংবাদপত্রের আবির্ভাব ঘটে।

এভাবে সুরু হয় বাংলার নবযুগের উদ্বোধন। আর সে যুগের সারথি রাজা রামমোহন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার সহায়তায় আধুনিক জ্ঞানভাণ্ডার আয়ত্ত করবার জন্য বাঙালীর ছেলে দিকে দিকে ছুটল। তৈরী হ'ল বাঙালী ছেলে মেয়েদের জন্য আধুনিক ইংরাজী স্কুল আর কলেজ।

বাঙালীর ছেলে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে শিখল।

দেশদেশান্তরের খবর সংবাদপত্র মারফত তাদের সামনে হাজির হ'ল। বাঙালীর ছেলে লিখতে লাগল, বক্তৃতা দিতে লাগল,—তর্কে বিতর্কে, রাজকার্যে, কাগজে-কলমে ইংরাজের সাথে পাল্লা দিতে লাগল। ঘুচে গেল ইংরাজ শাসনের ভয়।

রামমোহনকে তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা ম্লেচ্ছ ভাবাপন্ন, বিজাতীয়ের

অনুকরণকারী বলে নিন্দা করেছেন কিন্তু তাহা মিথ্যা। তিনিই খাঁটি হিন্দু ও জাতীয়তাবাদী। কোরানের একেশ্বরবাদ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল সত্য কিন্তু তিনি তাতে বিচলিত হন নি। তিনি তাঁর দেশের ও ধর্মের শাস্ত্রের মধ্যেই একেশ্বরবাদের সন্ধান পেলেন।

হিন্দুধর্মে প্রচলিত বিকৃত বিধির ফলে দলে দলে হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। যাদের মনকে তাহা ব্যাথায় ভারাক্রান্ত করে না তারাই হিন্দুধর্মের ও হিন্দু সমাজের সংস্কার প্রয়াসী রামমোহনকে সহ্য করতে পারল না।

হিন্দুর মূল শাস্ত্র বেদ ও উপনিষদকে তিনি সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সতীর আর্তনাদে হিন্দুসমাজ অভিশপ্ত হচ্ছিল। সতীদাহ প্রথা তুলে দিয়ে তিনি হিন্দুসমাজকে সে অভিশাপের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

পরদেশের ভ্রান্ত অনুসরণকারী তিনি নন। খৃষ্টান পাদরিরা তখন হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করে খৃষ্টানধর্ম প্রচারে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁর রচিত সেইসব প্রবন্ধ নিজ মুদ্রণালয় ধর্মতলা ষ্ট্রীটস্থ 'ইউনিটে-রিয়ান প্রেস' হতে প্রকাশিত 'ব্রহ্মানিক্যাল ম্যাগাজিন' এ বেনামীতে বার হয়। এই ব্যাপারেই তাঁর জাতীয়তা ও জাতীয় শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ লক্ষিত হয়।

বিদেশীয়গণ তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিচার বুদ্ধির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং ঐ সব দেশে তাঁর অনেক বন্ধু-বান্ধব হয়। কার্য উপলক্ষে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন।

সেখানে কিছুকাল অবস্থান করার পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃর্গত ব্রিষ্টল নগরে এই মহাপুরুষ প্রাণ ত্যাগ করেন।

পরাধীন ভারতের অমর্যাদা রামমোহনকে ব্যথা দিত। পৃথিবীর আধুনিক রাষ্ট্রগুলির সমকক্ষ করে ভারতকে গড়ে তুলতে তাঁর ছিল আকুল কামনা। তিনি ধারণা করেছিলেন—ইংরাজ শাসনের সংস্পর্শে

ভারতের ঘুম ভাঙবে আর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে মরণাপন্ন বাঙালী জাতি নব জাগরণের মন্ত্র লাভ করবে। তারই ফলে তারা আধুনিক রাজনীতি ও বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করবে এবং তখন তারা নিশ্চয় লড়বে সর্বপ্রকার কুশাসনের বিরুদ্ধে।

রামমোহনের সেদিনকার সে স্বপ্ন মিথ্যা হয়নি।

তাঁর দেশের লোকেরা কোন দিনই সহ্য করেনি অন্যায় কুশাসন। কখনও বা অহিংসবিপ্লবে, কখনও বা হিংসবিদ্রোহে তারা দিয়েছে সকল কুশাসনের জবাব।

বিদ্রোহীদের মত তিনি লাঠি, তলোয়ার, রিভলবার নিয়ে দাঁড়াননি। ইংরাজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি উগ্র হননি। তবুও তাঁর দান অক্ষয়, অসীম ও অসামান্য।

তাঁর ব্রাহ্মধর্মমত দিয়েছে জাতিকে সাম্য, ঐক্য ও জাতীয়তার মন্ত্র, তাঁর শিক্ষা ও সংস্কার জাতিকে দিয়েছে নূতন ভঙ্গিমায় দাঁড়াবার শক্তি ও সামর্থ।

আধুনিক ভারতের তাই তিনি জনক।

॥ দুই ॥

পাশ্চাত্য সভ্যতার কুহক

রাজা রামমোহন যুগের হাওয়ায় দেশকে জাগাবার জন্য ইংরাজী শিক্ষার আশ্রয় নিলেন কিন্তু মানবদরদী কয়েকজন ইংরাজ ছাড়া (হেয়ার, বেথুন প্রমুখ) সব ইংরাজের ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। তারা চাচ্ছিল একচেটিয়া শিল্প-বাণিজ্য মারফত বাংলার শিল্প ধ্বংস করতে আর ইংরাজী শিক্ষা ও খৃষ্টান ধর্মের প্রভাবে বাঙালীর জাতীয়তাবোধ একদম নিশ্চিহ্ন করে দিতে।

খৃষ্টান পাদরিরা প্রচার করতে লাগল—তারা অসভ্য ভারত

বাসীদের সভ্য করবার প্রত্যাদেশ পেয়েছে ভগবানের কাছ থেকে। নানান্ বুলি দিয়ে সারা ভারতকে খৃষ্টান করা ও ভারতের জাতীয়তা ধ্বংস করাই তাদের উদ্দেশ্য।

পাদরি আর খৃষ্টান শিক্ষকরা শিখাতে লাগল সাহেবিয়ানা। কুহকে পড়ে ইংরাজী স্কুল ও কলেজের ছেলেরা সাহেব হবার উল্লাসে ছুটল গির্জায়, ধরল মদের বোতল, চলল সাহেব-মেমের আড্ডায়।

বাংলার আশা-ভরসার স্থল ছাত্রদল। তারাই বাংলার মুখে দিল কালি। রামমোহনের শিক্ষা-পরিকল্পনা এভাবে বানচাল হয়।

ইংরাজী স্কুলে সাহেব মাস্টাররা হিন্দু ছেলেদের বেত মারে, হিন্দুর ঠাকুর দেবতা নিয়ে ঠাট্টা, তামাসা করে।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে খৃষ্টান পাদরিরা ধর্মপ্রচারের নামে হীনভাষায় হিন্দু ধর্মের গালিগালাজ করে। বাংলার মাটির উপর দাঁড়িয়ে তারা বাঙালীর কুৎসা রটনা করে।

ইংরাজী শিক্ষিত ছেলেরা তাই শুনে নিজধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান হয় কিন্তু একদিন হ'ল এর বিপরীত।

ইংরাজী শিক্ষিত ছেলে, খোদ হিন্দু কলেজের ছাত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায় হঠাৎ একদিন থম্‌কে দাঁড়ালেন পথে—শুনলেন পাদরির মুখে হিন্দুধর্মের কুৎসা।

লালবাজার। মোড়ে ভিড়। মাঝখানে পাদরি দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে—হিন্দুরা বড় বেইমান। সীতাকে রাবণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করল গরুড়পাখি। আর সেই পাখিটাকে কিনা মেরে ফেলল রাম। এই বেইমান জাত কি ভগবানকে পেতে পারে?

পাদরির বানানো কথা। রামায়ণের কথা। ভিড় ঠেলে ভূদেব পাদরির সম্মুখীন হলেন। বললেন—মিথ্যে কথা বলে মূর্খ লোকদের খৃষ্টান করছেন। আপনাদের খৃষ্টান ধর্মটা কি শুনি। যীশু ক্রুশে মরার সময় বলেছিলেন—ভগবান আমাকে পরিত্যাগ

করলেন। ভগবান যাঁকে পরিত্যাগ করলেন তাঁর ধর্মেই বা ভগবান পাব কি করে শুনি!

উচিত জবাবে পাদরির মুখ চুন হ'ল।

ইংরাজী স্কুলের সাহেবরা হিন্দুর ঠাকুর দেবতা নিয়ে তামাসা করত। সুযোগ পেলেই ভাল ভাল ছেলেদের খৃষ্টান করত। ডাফ কলেজের ছাত্ররাই বেশী খৃষ্টান হ'ত। শুধু খৃষ্টান করলে ছিল এক রকম। এর উপরে পাদরিরা আর শিক্ষকরা শিখাতে লাগল সাহেবিয়ানা।

রামমোহনের শিক্ষাপরিকল্পনা এভাবে বানচাল হ'ল। প্রগতির স্থলে এল বিকৃতি—সাহেবিয়ানা। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই অন্ধ অনুকরণের প্রথম প্রতিবাদ "ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায়"।

ভূদেবচন্দ্র

পরদেশলোভীরা যখন অন্যের দেশে যায় তখন তাদের সাথে আসে সৈন্য আর ধর্মপ্রচারক। ইংরাজরা যখন আমাদের দেশে হাজির হল তখন তাদের সাথে এল গোরা সৈন্য আর পাদরি ধর্ম প্রচারক—আর বাইবেল।

কামান দ্বারা ইংরেজ জয় করল বাংলা দেশ। বাইবেল নিয়ে পাদরিরা জয় করতে অগ্রসর হ'ল বাঙালী জাতটাকে কিন্তু বাঙালী জাতকে জয় করা অত সহজ নয়। বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা এ জাতির মাথার উপর দিয়ে গেছে তবু ভাঙেনি তার শিরদাঁড়া।

বাঙালীর সংস্কৃতি যখনই পঙ্কিল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে ধ্বংসের অতল সলিলে নামে তখন সুদক্ষ ডুবুরীর মত এক এক জন সুসন্তান সীমাহীন পঙ্ক থেকে উদ্ধার করেন বঙ্গ সংস্কৃতির রাজলক্ষ্মী,—অপরূপ মহিমায় প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর আসন বাঙালীর চিত্তসিংহাসনে।

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই মধ্যে একজন। ভূদেবচন্দ্রের

সময় বাংলা দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের কাল। তখন ছিল কোম্পানীর রাজত্ব। কোম্পানী বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। তার কারণ এই যে তখনকার রাজপুরুষরা বিদ্রোহের ভয়ে হিন্দু ও মুসলমানের প্রাচীন রীতিনীতির উপর হাত দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন এবং দেশের লোকের আধুনিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানে অজ্ঞান রাখা নিরাপদ মনে করতেন।

খৃষ্টান পাদরিরা, মহাত্মা ডেভিড হেয়ার প্রমুখ ফিরিঙ্গিরা এবং রাজা রামমোহন ছিলেন ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী।

দেশীয় লোকদের মধ্যে রামমোহন ছিলেন এ বিষয়ে অগ্রণী।

ইউরোপে তখন শিল্প-বিপ্লবের ফলে ধনী, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। দেশে দেশে গণতন্ত্র ও মুক্তির জন্য লেগেছে লড়াই। সাগরপারের এই সংগ্রাম ও স্বাধীনতার স্পৃহা এনেছে বিশ্বে তখন এক নূতন প্রেরণা।

এই অনুপ্রেরণার জোয়ার যাতে আমাদের দেশেও জাগে এই ছিল রাজা রামমোহনের লক্ষ্য। এই জন্য তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য ছিলেন এত উৎসাহী।

রাজা রামমোহন ও মহাত্মা হেয়ারের প্রচেষ্টায় ১৮১৮ সালের ২০ শে জানুয়ারী তারিখে যে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হ'ল তা উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে নামকরা ইংরাজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

বাংলার মেধাবী ছাত্র মাত্রই এই কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং এই কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্ররাই বাংলার সমাজ জীবনে চিরস্থায়ী চিহ্ন এঁকে গেছেন।

নদীর বুকে যখন জোয়ার আসে তখন আসে উত্তাল জলরাশির সাথে নানারকম আবর্জ্জনা। ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সাথে শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের মধ্য সঞ্চারিত হ'ল এক অপূর্ব জাগরণ কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ও ইংরাজ শিক্ষকদের প্রভাবে তাঁদের মধ্যে এল সাহেবিপনার নির্লজ্জ অনুকরণ স্পৃহা।

তাঁদের হাতে উঠল সুরার বোতল আর খানাপিনার টেবিলে উঠল গোমাংস।

পোষাকে, আহারে, আচার-ব্যবহারে তারা হলেন পুরোপুরি সাহেব। হিন্দুর ধর্ম, শাস্ত্র, ঠাকুর হ'ল অবহেলিত। যীশুর ধর্ম তাঁদের কাছে হ'ল শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

রামমোহনের সংস্কার ও আদর্শ পাদরিদের প্রচারে ও ফিরিঙ্গিদের প্রভাবে তলিয়ে গেল। সাহেবী সংস্কার প্রবল হ'ল।

পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্ছৃঙ্খলতা শুধু স্পর্শ করতে পারেনি সেদিন ভূদেবকে। ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার ঐতিহ্য তাঁর রক্তে, সুনীতি, ধর্মনিষ্ঠা সদাচার তাঁর পরিবারে, বাঙালীর সংস্কৃতি তাঁর অন্তরে। এই সংস্কৃতি তাঁকে সেদিন রক্ষা করল উচ্ছৃঙ্খলতার হাত থেকে। শুধু ভূদেবচন্দ্র সেদিন হাতে করলেন না মদের বোতল। হারালেন না হিন্দু ধর্মের উপর বিশ্বাস। হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে তিনি শুধু একা।

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বংশের আদিপুরুষ শ্রীহর্ষ। তাঁর এক পূর্বপুরুষ সন্তোষ মুকুট রায় যশোহর কুশদহ অঞ্চলে বাস করতেন। সে সময়ে মারাঠী বীর ভাস্কর পণ্ডিত হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য দিগ্বিজয়ে বার হন। উক্ত সন্তোষ মুকুট রায় বাংলায় মুসলমান শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উড়িষ্যায় যান এবং ভস্কার পণ্ডিতের সহিত মিলিত হ'ন। এই অপরাধে বাদশাহ তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।

তাঁর বংশধররা অতঃপর হুগলী জেলার অন্তপাতী আরামবাগ মহকুমার অধিবাসী হন। তাঁর পিতামহ কলকাতায় হরিতকি বাগান লেনে এসে বসবাস করেন। ভূদেবের পিতা বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন ছিলেন একজন নাম করা সংস্কৃত পণ্ডিত।

তিনি "বিদ্বন্মোদযন্ত্র" নামক ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং 'মনুসংহিতা'র বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরিণত বয়সে তিনি জজ পণ্ডিত নিযুক্ত হন।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নামকরা দেশনেতা তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বাল্যকালে তাঁর কাছে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন।

ভূদেবচন্দ্রের জন্ম ১৮২৫ সনে কলকাতায় হরিতকি বাগান লেনের বাসা বাটিতে। তাঁর ছাত্রজীবন চলে ১৮৩৪ সন থেকে ১৮৪৫ সন পর্যন্ত। নয় বৎসর বয়সে তাঁর বিদ্যারম্ভ হয় এবং সমাপ্তি ঘটে একুশ বছর বয়সে। তাঁর জন্মের বৎসর খানেক আগে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। তিনি প্রথম দুই বৎসর এই কলেজে সংস্কৃত পড়েন। এ সময়ে তিনি গোপনে ইংরাজী পড়তে সুরু করেন। ইংরাজী ভাষার প্রতি তাঁর আকর্ষণ লক্ষ্য করে তাঁর পিতা তাঁকে ইংরাজী স্কুলে ভর্তি করে দেন। তিন চারিটি ইংরাজী স্কুলে কিছুদিন পাঠাভ্যাস করার পর তিনি চোদ্দ বৎসর বয়সে হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন।

তখনকার দিনে হিন্দুকলেজে এক এক ক্লাসে এক এক জন মাস্টার থাকতেন।

সপ্তম শ্রেণীতে তখন রামচন্দ্র মিত্র ছিলেন শিক্ষক। তিনি একদিন পৃথিবীর গোলত্ব বোঝাচ্ছেন ক্লাসে। বোঝাবার সময় তিনি বললেন, পৃথিবী যে গোল 'তা হিন্দুরা জানত না।

ভূদেব পিতার কাছে একথা বলতেই তিনি একখানা সংস্কৃত পুঁথি বার করে দেখালেন যে পৃথিবী যে গোল তা হিন্দুরা জানত।

ভূদেব শ্লোকটা মুখস্থ করে রাখলেন এবং পরদিবস ক্লাসে রামচন্দ্র মিত্রকে শুনালেন—করতল কলিতামল কবদমলং বিদন্তি যে গোলং।

ভূদেবচন্দ্র শিক্ষককে বললেন—এ শ্লোক হিন্দুর তৈরী। ইংরাজদের অনেক আগেই তাঁরা জানতেন, পৃথিবী গোল।

ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি বিদ্রূপাত্মক ইঙ্গিতে সেদিন ক্ষুব্ধ ভূদেব উচিত জবাব দিয়েছিলেন শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্রকে—যিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে নিজের সভ্যতাকে বিদ্রূপ করতে সাহসী হয়েছিলেন।

ভূদেব তাঁর সেই স্পর্ধাকে মাটির ধূলায় নামিয়ে দিলেন। এমনি ছিল তাঁর শিশু বয়স থেকে ভারতের গৌরবের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। হিন্দু-ধর্ম, সমাজ, আচার-ব্যবহার নিয়ে ঠাট্টা করা যেদিন হিন্দুকলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের ছিল অভ্যাস সেদিন বালক ভূদেব মানতে চান নি হিন্দুর সব কিছু খারাপ। বুক ভরা বিশ্বাস নিয়ে তিনি প্রমাণ করে ছাড়লেন হিন্দুর শাস্ত্র যেমন প্রাচীন, তেমন গৌরবময়।

এই ব্যাপারে ভূদেবের হৃদ্যতা জন্মে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাথে। তিনিও তখন ঐ শ্রেণীর ছাত্র।

ভূদেবচন্দ্র মধু প্রমুখ কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে পর বৎসর ডবল প্রমোশন পান এবং সপ্তম শ্রেণী থেকে একেবারে পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হন। এবৎসর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের জুনিয়ার পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়। ভূদেব এই পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রথম স্থান অধিকার করেন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। এতে বোঝা যায় ভূদেব মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। পর বৎসর এই প্রতিভার পুরস্কার স্বরূপ ভূদেব একেবারে পঞ্চম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন।

মধুসূদনও এভাবে উন্নীত হলেন। স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক একটি ইংরাজী প্রবন্ধ লিখে মধুসূদন একটি সোনার পদক এবং ভূদেবচন্দ্র একটি রূপার পদক লাভ করেন।

এই বৎসর মধুসূদন খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। ভূদেবচন্দ্রের মনও খৃষ্টান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় কিন্তু তিনি সে পথ থেকে নিবৃত্ত হন।

পর বৎসর ভূদেব প্রথম শ্রেণীতে উঠেন এবং সিনিয়র পরীক্ষা দেন। পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তিনি মাসিক চল্লিশ টাকা করে বৃত্তি পান। ১৮৪৫ সনে তিনি হিন্দুকলেজ থেকে পাশ করে কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হন।

এ সময়ে একটা ঘটনা ঘটে যার জন্য অনেক ভাল ভাল চাকরির

লোভ ত্যাগ করে তাঁকে বেসরকারি স্কুলে অল্প বেতনে শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করতে হয়। এই খানেই ভূদেবচন্দ্রের আসল পরিচয়।

রামমোহন চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার জোয়ার নিয়ে আসতে বাঙালীর প্রাণে কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা প্রচারে উৎসাহী সাহেবরা চেয়েছিলেন অন্যরূপ। তাঁরা এই সুযোগে পাশ্চাত্য সভ্যতার নাগপাশে বাঙালী জাতটাকে বেঁধে তার বাঙালীত্ব নষ্ট করতে চেয়েছিলেন। সাহেব শিক্ষকরা প্রকাশ্যে দেশীয় ছাত্রদের খৃষ্টান হবার জন্য প্ররোচিত করতেন। নিজের ধর্ম ভুলে ছাত্ররা হতে লাগল খৃষ্টান। বাংলার আচার ব্যবহার কৃষ্টি ভুলে হতে লাগল সাহেব।

ডাফ সাহেবের স্কুলের অবস্থা ছিল চরম। এখানে খৃষ্টানী ধর্ম আর সাহেবী আচার ছাত্রদের শেখান হত।

কলকাতার অভিভাবকরা সাহেবদের স্কুলে ছেলে পড়াতে দিতে বিমুখ হ'লেন।

ছেলেদের সুশিক্ষার জন্য বাঙালীর পরিচালনাধীনে বিদ্যালয় স্থাপনার হুজুক উঠল।

ভূদেবচন্দ্র এই ব্যাপারে ছিলেন উৎসাহী।

এই সব হুজুগে মতিলাল শীলের এক লক্ষ টাকায় স্থাপিত হ'ল শীলস্ ফ্রি কলেজ এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় স্থাপিত হ'ল হিন্দুদাতব্য প্রতিষ্ঠান। (Hindu Charitable Institution) নামক বিদ্যালয়।

ভূদেবচন্দ্র মাসিক ষাট টাকা বেতনে এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। অতঃপর বছর খানেকের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে তিনি দুবছর যাবত নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

তাঁর এই প্রচেষ্টায় ১৮৪৭ ও ৪৮ সালে স্থাপিত হয় চন্দননগর সেমিনারি, শ্রীপুর স্কুল (বলাগড়), বহরমপুর স্কুল, আন্দুল স্কুল এবং তমলুক স্কুল।

পর বৎসর সাংসারিক অনটন হেতু তাঁকে পঞ্চাশ টাকা বেতনে মাদ্রাসা কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করতে হয়। ঐ বৎসরেই তিনি মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে হাওড়া স্কুলে হেডমাস্টারের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদে তিনি ১৮৫৬ সাল পর্য্যন্ত অধিষ্টিত ছিলেন।

উক্ত সনে নব নির্মিত হুগলী নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের জন্য একটি প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা হয় এবং ভুদেবচন্দ্র এই পরীক্ষায় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে পরাজিত করে উক্ত পদ লাভ করেন।

১৮৬৬ সালে তিনি অতিরিক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি কিছু দিন বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের এবং বাংলা সরকারের শিক্ষাবিভাগের অস্থায়ী পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পেন্‌সন্ পান।

এর পর তিনি আরও এগার বৎসর জীবিত থাকেন। চাকরি জীবন থেকে বিদায় নিয়ে তিনি তাঁর জীবনের এই অবশিষ্ট কালটুকু বসে কাটান নি। এসময় তিনি সুনীতিমূলক শিক্ষা বিস্তারের জন্য পুস্তক রচনায় হাত দেন।

তাঁর রচিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ক্ষেত্রতত্ত্ব, ইংলণ্ডের ইতিহাস, পুরাবৃত্ত সার, রোমের ইতিহাস ছাত্রদের জন্য লিখিত।

শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব শিক্ষকদের জন্য, আর আচার প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ ও সামাজিক প্রবন্ধ গৃহস্থদের জন্য লিখিত। এ ছাড়া, তিনি এডুকেশসন গেজেট নামক সংবাদপত্রের সম্পাদনাও করেন।

ভূদেবের সাহিত্যে আমরা পাই বাঙালী সভ্যতা মাফিক সুশিক্ষা আর আর্যধর্ম সম্মত পারিবারিক ও সামাজিক সুনীতির আবেদন।

সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চার জন্য তিনি দুই লক্ষ টাকা দান করেছেন

এবং এই কলেজের জন্য তিনি তাঁর পিতার নামে 'বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট্ ফাণ্ড' গঠন করেন।

এ ছাড়া তিনি তাঁর নিজ বাড়িতে পিতার নামে 'বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী' ও মাতার নামে 'ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়' স্থাপন করেন।

১৮৯৪ সালের ১৬ই মে ভূদেবচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

সেদিন বাঙালীর অন্তরে লেগেছে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার উন্মাদনা। পাশ্চাত্য সভ্যতার জোয়ারে সেদিন যে উচ্ছৃঙ্খলতা' দেখা দিয়েছিল তা কেটে গেছে।

ভূদেবের বাঙালীর সংস্কৃতিগত সুশিক্ষা আর সামাজিক ও পারিবারিক সুনীতির আবেদনে, ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কার মূলক আন্দোলনে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেনের ব্রাহ্মধর্মের সাম্য, ঐক্য ও জাতীয়তা প্রচারে, রামগোপাল প্রমুখ ইংরাজী শিক্ষিতদের সুশাসনের দাবীতে, রাজনারায়ণ বসু ও নব গোপাল মিত্রের স্বাদেশিকতার প্রেরণায়, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের স্বরাজ সঙ্কল্পে, বিবেকানন্দের ধর্মে ও কর্মের বাণীতে আর সর্বোপরি হেম, মধু, ঈশ্বর গুপ্ত, ভূদেব, বঙ্কিম, নবীন, রঙ্গলাল প্রমুখ বাঙালা সাহিত্যিকদের লেখায় মহিমময়ী বঙ্গসংস্কৃতির অভাবনীয় আবাহনে এসেছে সে এক নূতন দিন—বাংলার ইতিহাসে যা কেউ কোন দিন দেখেনি।

॥ তিন ॥

সাদা-কালোর ভেদাভেদ

জাতীয় মর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টা

আধুনিক ভারতের জনক রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর (১৮৩৩) থেকে আধুনিক ভারতের মুক্তিপথের অগ্রদূত কংগ্রেসের আবির্ভাব (১৮৮৫) পর্যন্ত অর্ধশতাব্দীকাল প্রায় পঞ্চাশ বছর।

এই কালের মধ্যবিন্দু সিপাই বিদ্রোহ—ভারতের প্রথম ব্যাপক জাতীয় সংগ্রাম।

সমগ্র কালটায় তাই ছুটি ভাগ। রামমোহনের মৃত্যু থেকে বিদ্রোহ পর্যন্ত একটি কাল আর সিপাই বিদ্রোহ থেকে কংগ্রেসের আবির্ভাব পর্যন্ত আর একটি কাল।

প্রথম কালটির মূল কথা :—

জাতির মর্যাদারক্ষার প্রচেষ্টা।

দ্বিতীয় কালটির মূল কথা :—

সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব।

ভারতীয় লোকদের শাসনযন্ত্রে স্থান নাই। বড় বড় চাকরি তারা পায় না।······

বাংলার প্রাঙ্গণভরা আর্তনাদ। বিপর্যস্ত কৃষক, কারিগর। অপরাধী ইংরাজের সাত খুন মাপ। নামমাত্র বিচার। বিচার হতে পারত তাদের মাত্র একটি আদালতে—সুপ্রীম কোর্ট। সেখানকার জজ সব ধলা। বিচার হ'ত অমনি।···

অসম শাসনের জ্বালায় কাতর সেদিন ভারত। ব্রহ্মধর্মমত অন্ধকার গগণে উজ্জ্বল তারার মত ভাতি দিল সেদিন। রামমোহনের

শিষ্য প্রিন্স দ্বারকানাথ সেদিন জাতীয় মর্যাদারক্ষার চেষ্টা নিয়ে অগ্রণী হলেন।

১৮৩৭ সনের ১০ই নভেম্বর তারিখে তিনিই প্রথম স্থাপনা করলেন সকল শ্রেণীর জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—জমিদার সভা; জমিতে যাদের স্বার্থ অর্থাৎ সর্বশ্রেণীর লোকের সমিতি এই জমিদার সভা।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের দল মনে করতেন যে ইংরাজের সুশাসন, ইংরাজী ভাষা মারফৎ আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং ইংরাজের যান্ত্রিক শিল্প ঘটাবে এ দেশের উন্নতি।

তখনকার নামকরা ছাত্র রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতি দ্বারকানাথ ঠাকুরের দলে যোগ দিলেন এবং স্থাপনা করলেন দ্বিতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়ন সোসাইটি। ১৮৪৩ সালের ২০শে এপ্রিল তারিখের কথা এ।……

ইংরাজী স্কুলের সাহেবরা সুযোগ পেলেই ভাল ভাল ছেলেদের খৃষ্টান করত। হিন্দু, ব্রাহ্ম সকল বাঙালীই সাহেবদের স্কুলে আর ছেলে পাঠাতে রাজি হ'ল না। বাঙালীরা নিজেরা স্থাপনা করতে লাগল বিদ্যালয়। বিদ্যালয় স্থাপনার হুজুগ চলল চারিদিকে।

নিষ্ঠাবান হিন্দুরা যখন শিক্ষাবিস্তার করে হিন্দুয়ানি বজায় রাখছিল ব্রাহ্মরা তখন সংবাদপত্র আর সমিতি দ্বারা জাতীয় মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করছিল।

অপরাধী ইংরাজের বিচার হত না সাধারণ আদালতে—হত সুপ্রীমকোর্টে। বিচার করত শুধু ইংরাজ জজ। দেশীয় জজ তাদের বিচার করতে পারত না। ইংরাজদের মধ্যে দু একজন লোক ছিলেন ভাল—যেমন হেয়ার, বেথুন।

বেথুন সাহেব তখন বড়লাটের সভার সভ্য। তিনি ভারতীয়দের এই অমর্যাদা দূর করবার জন্য ইংরাজ ও ভারতবাসীর একই প্রকার বিচারের সুপারিশ করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি আইনের পাণ্ডুলিপি বড় লাটের সভায় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পেশ করেন।

জাতীয় মর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টায় এই আইন যাতে পাশ হয় তার জন্য বাঙালীরা সুরু করল অন্দোলন। তাদের দাবী ও আকাঙ্ক্ষার বাণী সংবাদপত্রের পর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে লাগল।

রামমোহনের যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার আহবানে যেমন সেদিন অনেক সংবাদপত্র জন্ম নিল তেমন এদিন এই জাতীয়তার আহ্বানে ভূমিষ্ঠ হ'ল কখানা সংবাদপত্র—জ্ঞানান্বেষণ, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি। এই আন্দোলনের অগ্রণী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাতীয়তার অনুপ্রেরণায় 'জমিদার-সভা' ও 'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি'র মিলনে ১৮৫১ সনের ২৯শে অক্টোবর তারিখে 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' গঠিত হ'ল।

সাহেবরাও পক্ষান্তরে বেথুনের আইনটি যাতে পাশ না হয় তার জন্য আন্দোলন করল। তারা এ আইনের নাম দিল 'কালা আইন'। সাহেবদের জয় হ'ল। কালা আইন পাশ হল না।

কালা আইন পাশ না হওয়ায় শিক্ষিত দেশীয় লোকেরা বুঝলেন তাঁরা কত অসহায়। যে ইংরাজ শাসনের উপর তাদের ভরসা তা তাদের দেশ ও জাতির জন্য নয়—ইংরাজদের জন্য।

ইংরাজ শাসনের উপর তাদের বিরূপ মনোভাব দেখা দিল। এরই সম সময়ে এল বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ। সব শেষে সিপাহী বিদ্রোহ।

এই বিদ্রোহের পরিণতি বাংলার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নেতাদের মনে ভীতির সঞ্চার করল এবং জাতীয় মর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টা ছেড়ে জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখতে সচেষ্ট হলেন। স্বার্থের খাতিরে তাঁরা নির্জন পথের ধারে ফেলে দিতেন জাতীয়তার পতাকা।

॥ চার ॥

বাঙালী সমাজে ভাঙাগড়ার খেলা ঃ
এল মুক্তি-সংগ্রামের মঞ্চ কংগ্রেস (১৮৮৫)

বাঙালীর সমাজের সর্বস্তরে জাগে ভাঙাগড়ার খেলা। এর মূলে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব। একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের নেশা,—আর অন্যদিকে নিজ দেশধর্ম সভ্যতার পথে প্রত্যাবর্তনের ডাক। একদিকে সাহেবিয়ানা,—অন্যদিকে স্বাদেশিকতা।

স্বাদেশিকতার পথে ডাক দিলেন ভূদেবচন্দ্র আর ঈশ্বরচন্দ্র।

ভূদেব প্রচার করতে লাগলেন পারিবারিক ও সামাজিক সুনীতি আর ঈশ্বরচন্দ্র প্রচার করতে লাগলেন বাঙালীর বাঙালীত্ব আর সমাজ সংস্কার।

রাজনারায়ণ বসু প্রচার করলেন সাহেবিয়ানার স্থলে হিন্দুয়ানি। কাব্যে আর ছন্দে মাইকেল, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, নবীন সেন আর সাহিত্যে দীনবন্ধু, বঙ্কিম সৃষ্টি করলেন বাংলার সর্বস্তরে জাতীয়তা-বোধ। এমনি করে জাগে নূতন বাংলা।···

···বাঙালী সমাজের সর্বস্তরে উঠে ভাঙাগড়ার রব। ইট, পাটকেল, চুনসুরকি হুড়মুড় করে পড়েছে একদিকে আর অন্যদিকে শোনা যাচ্ছে রাজমিস্ত্রির হস্তে কর্ণিকের শব্দ।

ইংরাজী শিক্ষার উগ্রপ্রভাবে যাঁরা একদিন হাতে নিয়েছিলেন মদের বোতল, ভুলেছিলেন নিজের দেশ, ধর্ম, সভ্যতা, শিখেছিলেন আচারে, ধর্মে, পোষাকে সাহেবিয়ানা তাঁদেরই অগ্রণী প্রখ্যাতনামা শিক্ষক রাজনারায়ণ বসু বার্ধক্য দশায় অনুধাবন করলেন ভ্রান্ত পথ

থেকে-প্রত্যাবর্তনের ডাক। তিনি নবগোপাল মিত্রের সাথে নামলেন স্বাদেশিকতা প্রচারে।

১৮৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে চৈত্র সংক্রান্তির দিন তাঁরা হিন্দুমেলা নামক স্বদেশী ভাবোদ্দীপক মেলার অনুষ্ঠান করেন। রবি ঠাকুরের বাড়ির লোকেরা এই মেলায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

এই মেলায় স্বদেশী গান গীত হত এবং দেশী শিল্প ও ব্যায়াম প্রদর্শিত হত। এ ভাবে সমাজে প্রচারিত হয় স্বাদেশিকতা।

* * *

ওদিকে নিষ্প্রভ ব্রাহ্মধর্মের শিখা আবার জ্বলে উঠল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তদীয় সুযোগ্য সহচর কেশব সেনের কর্মে। শিক্ষা, সমাজ, সংস্কার, নারীজাগরণ, একজাতীয়তা দিকে দিকে ব্রাহ্মরা প্রচার করেন।

প্রগতির সাড়া পড়ল কুসংস্কারে জর্জরিত, জাত-অজাতের প্রশ্নে কলুষিত হিন্দু সমাজের ভিতর। সেখানেও জাগল কর্মচঞ্চলতা।

* * *

সেদিন সুরু হয় দেশ-প্রেমাত্মক কর্মযুগের সূচনা। এ যুগের নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, আনন্দমোহন বসু, মনমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল। তাঁরা স্থাপনা করেন 'ভারত সভা' নামক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এই 'ভারত-সভা'।

"ভারত-সভা" সর্বভারতীয় আন্দোলনের প্রথম রূপ। 'ভারত সভা'র আদর্শ পূর্ণ স্বাধীনতা। সরকারের সহিত অসহযোগ নীতি ছিল পরিকল্পনা।

"ভারত-সভা"র নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী স্বয়ং সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেন এবং অন্যান্যরা কেহই সরকারি চাকরি গ্রহণ করেন না।

কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করে ১৯৩০ সনে। ১৯২১ সনে সুরু করে অসহযোগ আন্দোলন। তার কত বছর আগে

বাঙালীর প্রতিষ্ঠান এসব চিন্তা করেছিল। তাই গোখলে একদা বলেছিলেন—বাঙালী আজ যা ভাবে বাকি ভারত ভাবে তা কাল।

বাঙালী প্রথম ভেবেছে আরও একটা জিনিষ—কৃষক ও মজুর আন্দোলন।

নীল বিদ্রোহে বাংলার কৃষকই প্রথম শোনাল শোষিতের আর্তনাদ ও সংগ্রামের কাহিনী।...

সুদূর আসামের চা বাগানে ভারতীয় কুলিদের উপর লোক চক্ষুর অন্তরালে যে অপরিসীম নির্যাতন চলত তা ভারত সভার নেতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী শ্রমিকের ছদ্মবেশে অনেক সময় জীবন বিপদাপন্ন করে জেনে আসেন এবং সর্বসাধারণে প্রকাশ করেন।...

প্রখ্যাত বক্তা বিপিন পাল, প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও নেতা ডাঃ মহেন্দ্র সরকার প্রভৃতির চেষ্টায় চা-বাগানের শ্রমিকদের দুর্দশার কথা আসামের চিফ্ কমিশনার হেনরি কটনের মনযোগ আকর্ষণ করে। তাঁর চেষ্টায় আড়কাটির অত্যাচার কমে যায় এবং বাধ্যতামূলক কাজ করবার আইন লুপ্ত হয়।

চা-বাগানের অসহায় কুলিদের নিয়ে যখন বাংলার নেতারা আন্দোলন করছিলেন, তখন দক্ষিণ ভারতের দুর্ভিক্ষ ও ইলবার্ট বিল বাংলা তথা ভারতে প্রবল উদ্দীপনা আনে।

*　　　*　　　*

দক্ষিণভারতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। সরকার দুর্ভিক্ষ দমনের কোন চেষ্টা করল না। উপরন্তু দুর্ভিক্ষের সাহায্য কার্যের জন্য যে টাকা সরকারের হাতে ছিল তা দুর্ভিক্ষের জন্য ব্যয় না করে আফগান যুদ্ধের জন্য ব্যয়িত হয়।

বাঙালী তার ভারতবাসী ভাইদের দুঃখে সংবাদপত্র মারফৎ প্রবল আন্দোলন চালায়। সংবাদপত্রের এই তীব্র আন্দোলন সরকারকে ভয়াতুর করল। দেশীয় ছাপাখানার উপর নানাবিধ বিধিনিষেধ

বসালেন বড়লাট লিটন সাহেব এবং পাশ করলেন সংবাদপত্র দমন আইন।

দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। শুধু এই নয়। আরও নির্যাতন স্থরু হল'। পাশ হ'ল আর্মস্ অ্যাক্ট। বিনা লাইসেন্সে অস্ত্ররাখা ভারতবাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ হ'ল।

ক্ষুব্ধ হ'ল ভারতের লোক।...

* * *

...এল ইলবার্ট বিল।

...আগে দেশীয় বিচারকরা সাহেবদের বিচার করতে পারতেন না। বড়লাট রিপন এই বৈষম্য দূর করবার জন্য তাঁর আইন সচিব ইলবার্টকে আইন প্রণয়নের ভার দেন। ইলবার্টের বিল পাশ হ'ল কিন্তু যে আকারে পাশ হ'ল তাতে ভারতবাসী খুসী হ'তে পারল না। ভারত হ'ল আরও ক্ষুব্ধ।...

* * *

নেতা স্থরেন্দ্রনাথের হ'ল কারাদণ্ড।

দেশময় বিক্ষোভ।

প্রবল আলোড়নের মধ্যে কলকাতায় বসল ভারত সভার পরিকল্পিত সর্বভারতীয় সম্মেলন—জাতীয় সম্মেলন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের বড় দিনে।

সাফল্যের সাথে এর সমাপ্তি হ'ল।

* * *

সর্বভারতীয় এই সংগঠনে ভয় পেল ইংরাজরা। ইংরাজদের নেতা হিউম সাহেব পাল্টা সম্মেলন আহ্বান করলেন পর বৎসর যখন স্থরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতাদের জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন স্থরু হয়।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা সহরে জাতীয়

সম্মেলনের অধিবেশন বসল, আর ঠিক সেই সময় হিউমের আহুত 'কংগ্রেস' সম্মেলন বসল বোম্বাই-এ।

*　　　*　　　*

বাংলা তখন নবজাগরণের কেন্দ্র। বাঙালী ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে এই কংগ্রেসকে জনপ্রিয় করবার চেষ্টা হ'ল। তবুও "জাতীয় সম্মেলন" এর মতন এর নাম হ'ল না—কারণ "জাতীয় সম্মেলন"-এ ছিলেন সকল জনপ্রিয় নেতা।

কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন (১৮৮৬) তাই জাতীয় নেতাদের নিয়ে হ'ল। বাঙালীর জাতীয়তার সাধনার মধ্য দিয়ে জন্ম নিল এমনি করে কংগ্রেস।

॥ পাঁচ ॥

বিবেকানন্দের দেশসেবা ও দেশ গঠনের মন্ত্র

স্বাদেশিকতা, কর্মসঙ্কল্প ও সংস্কার মুক্তির নূতন আদর্শ ও নূতন পথ

ইংরাজী শিক্ষায় যেমন সুফল দেখা দিল তেমন দেখা দিল কুফল। বিদেশী সভ্যতার পাল্লায় পড়ে শিক্ষিত লোকেরা নাস্তিক ও বিধর্মী হন।

এরই প্রতিক্রিয়ায় ও শাসক ইংরাজের সাদা-কালার ভেদ-বোধের প্রতিবাদে ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতার কুহক থেকে প্রত্যাবর্তনের অমোঘ আহ্বান এল দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমণির কালীবাড়ির পূজারী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট থেকে। নাস্তিক ও বিধর্মীরা তাঁর কাছে এসে পেলেন সত্যের সন্ধান।

তাঁরা বুঝলেন বাঙালীর নিজস্ব সব কিছুই আছে। পরের দেওয়া কাঁচ সোনা বলে গ্রহণ করা অন্যায়।

বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথের সহিত কণ্ঠ মিলিয়ে নবজাগ্রত বাঙালীর জাগল প্রার্থনা :

তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
হে ভারত লবো শিক্ষা।

একদিন এই প্রত্যাবর্তনের আহ্বান শুনলেন কলকাতার সিমলা পল্লীর এক তরুণ যুবক। তিনি প্রতিভাবান, সর্বশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী কিন্তু নাস্তিক, ভারতীয় সভ্যতার উপর আস্থাহীন।

তরুণের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্পর্শে এসে এঁর নাস্তিকতা এবং স্বধর্মের প্রতি অনাস্থার ভাব কেটে যায় এবং তিনি হ'ন রামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য ও তাঁর পরবর্তী নাম হয় স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ দিলেন দেশ সেবা ও দেশ গঠনের আহ্বান। স্বাদেশিকতার মহান এক চেতনা, দুর্জয় এক সঙ্কল্পের ইসারা দিলেন তরুণ এই সন্ন্যাসী। তাঁর বলিষ্ঠ হৃদয়, সংস্কৃত মন বিমূঢ় বাঙালীর সামনে তুলে ধরল এক নূতন আদর্শ, এক নূতন পথ।

বিবেকানন্দ

পাশ্চাত্য সভ্যতার জোয়ারে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল তা কেটে গিয়ে এল স্বাদেশিকতার স্তিমিত ঢেউ। বাঙালী পশ্চিম দিক থেকে তাকাল পূর্বদিকে। তাকাল নিজের দেশের পানে কিন্তু চলার পথে সঙ্কোচের ভাব—বুকে সংশয়, দ্বিধা···চোখে ভীরুতা।

সেদিন বিবেকানন্দর বজ্রকণ্ঠ ভারতবাসীর বুকে আঘাত দিয়ে ভাঙল এ সঙ্কোচ, শোনাল নূতন বাণী—

উত্তিষ্ঠ জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নি বোধত্।

ভারতের কানের কাছে ঘোরে সে বজ্রকণ্ঠের চাপা আওয়াজ—তোমরা ভারতবাসী! তোমরা কারো চেয়ে ছোট নও। সাময়িক পরবশতায় তোমরা নীচু হয়ো না। তোমরা অমৃতের সন্তান।

তোমাদের পূর্বপুরুষগণ শুনিয়েছেন নূতন নূতন জ্ঞান ও কর্মের বাণী। আজ আবার তোমরা এই ক্ষুধার্ত, লোভী, দস্যু পশ্চিমকে শোনাবে আধ্যাত্মিক শক্তি ও শান্তির বাণী। জাগো…উঠ…।

সমগ্র ভারত সেদিন আকুল পুলকে চাইল সন্ন্যাসীর পানে। সন্নাসীর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল মূক ভারতের বাণী পশ্চিমের দ্বারে দ্বারে। প্রতীচ্যের শত শত মানুষ নত হ'ল সেই গৈরিক বসনের সামনে, উন্নত উষ্ণীষের তলে, প্রশান্ত অবয়বের পানে।

উনবিংশ শতাব্দীর সংক্রান্তি…বিংশ শতাব্দী সম্মুখে—সেই সন্ধিক্ষণে অবির্ভূত হন স্বামী বিবেকানন্দ।

উনবিংশ শতাব্দী যেমন রাজা রামমোহন রায়ের হাতে গড়া, তেমন বিংশ শতাব্দী স্বামী বিবেকানন্দের হাতে গড়া। উনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লব এল ভারতের চিন্তা জগতে রাজা রামমোহন রায়ের বাণীতে আর বিংশ শতাব্দীর বিপ্লব এল ভারতের কর্ম জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে।

চিন্তার পর কর্ম। কর্ম দেশের আসল রূপ। তাই আধুনিক ভারতের রূপকার স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তারিখে কলকাতার সিমলা নামক পল্লীতে ৩নং গৌর-মোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট বাড়ীতে তিনি এক কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ ঈশ্বর প্রেমে গৃহত্যাগী হন এবং পিতা বিশ্বনাথ দত্ত খৃষ্টান ধর্মের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হন। নরেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য

শিক্ষায় মানুষ। অধিকাংশ পাশ্চাত্য শিক্ষিত লোকের মত তিনিও বাল্যকালে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের উপর আস্থা হারান। তিনিও পিতার মত খৃষ্টান ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর তাঁর বহুমূত্রের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগই তাঁর কাল হয়। এই নিষ্ঠুর ব্যধি ভারতের এই অমূল্য রত্নকে অকালে ভারত মাতার বুক থেকে অপসারিত করে ইংরাজী ১৯০২ সালে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে মামলা হয়। এই পারিবারিক বিপদে তিনি সাহস ও উদ্দীপনা পান তাঁর পরমারাধ্যা জননী ভুবনেশ্বরী দেবীর নিকট থেকে। ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন আদর্শ নারী। স্বামী বিবেকানন্দ বাল্যে ও পরবর্তীকালের কর্মজীবনে সব সময় এই আদর্শ নারীর স্নেহ ও উৎসাহ পেতেন।

কলকাতার একটি খৃষ্টান কলেজ থেকে তিনি বি. এ. পাশ করলেন। তিনি শুধু বিদ্যায় নয় সর্ব বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তিনি মুষ্টি যুদ্ধ করতে, সাঁতার দিতে, দাঁড় টানতে, ঘোড়ায় চড়তে পারতেন এবং চমৎকার গান করতে পারতেন। যেমন ছিল তাঁর সুন্দর চেহারা, তেমন ছিল মিষ্ট গলা। এতগুলো গুণের জন্য তিনি ছিলেন সর্বজন-প্রিয়। যেখানেই তিনি গিয়েছেন—দেশে অথবা বিদেশে, সেখানেই তিনি সবাইকে আপনার করেছেন। এমনি ছিল তাঁর শক্তি।

পাশ্চাত্য সভ্যতা আর সাহেবীপনা দেশের তখন আর ভাল লাগছিল না। ঘরের দিকে ফিরছে তখন দেশের মন। জাগছে স্বাদেশিকতা। বিবেকানন্দের চোখে তখন বাইবেলের স্বপ্ন। স্বাদেশিকতার জাগরণে বাইবেল আর ভাল লাগে না তাঁর। অথচ ভগবানের জন্য তাঁর মন পাগল। কে দেবে তাঁকে ভগবানের সন্ধান। কোন ধর্ম? খৃষ্টানধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম…না হিন্দুধর্ম? মানসিক দ্বন্দ্বে নরেন্দ্রনাথ সেদিন পাগল।

হঠাৎ একদিন নরেন্দ্রনাথ শুনলেন দক্ষিণেশ্বর কালিবাড়ির এক পূজারী ব্রাহ্মণের কথা। তিনি নাকি কালি মূর্তির সাথে কথা বলেন। মাঝে মাঝে নাকি তাঁর সমাধি হয়। তাঁকে দেখবার জন্য নানান্ দেশ থেকে নানান্ লোক আসে। সাহেব, ব্রাহ্ম, মুসলমানও বাদ যায় না। নরেন্দ্রনাথও একদিন গেলেন কিন্তু মনে ধরলনা। ব্রাহ্মণ লেখা পড়া জানেন না। কথা বলেন সেকালের লোকের মত। চাল-চলনও সেকেলে।

তাচ্ছিল্যের সাথে নরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন—ভগবানকে দেখাতে পার।

হুঁঃ।

'নিজে দেখেছ?' প্রশ্ন করলেন নরেন্দ্রনাথ।

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন—হুঁ। যেমন তোকে সামনে দেখছি তেমন তাঁকেও দেখতে পাই—আরও নিবিড়ভাবে। নরেন্দ্রনাথ ফিরে এলেন বাড়ীতে।

পূজারী সম্পর্কে তাঁর ধারণা হ'ল—এ একটা ভণ্ড। কেউ ভগবান দেখলে না, চাষা গণ্ডমুর্খ ভগবান দেখল। বুজরুকি ছাড়া আর কি?

এই চাষা গণ্ডমুর্খই রামকৃষ্ণ পরমহংস। নরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ গুরু।

কদিন পর। নরেন্দ্রনাথের পাড়ায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ি। সুরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের ভক্ত। একদিন সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ি এলেন রামকৃষ্ণ। সে আসরে নরেন্দ্রনাথ একটি গান করেন। গান শুনে রামকৃষ্ণের সমাধি হয়।

সেদিন রাত্রে রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বললেন—তুই আর যাস্‌নে কেন? তোকে না দেখলে যে আমি একদণ্ডও থাকতে পারি নে।

নরেন তখন ব্রাহ্মসমাজে ঘোরাঘুরি করছেন।

এর পর তিনি যাতায়াত সুরু করলেন দক্ষিণেশ্বরে।

১৮৮১ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল। এই পাঁচ বৎসর কাল নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের সাহচর্যে কাটান।

প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর কেবল যাতায়াত চলল কিন্তু তৃতীয় বৎসরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপর তাঁর প্রবল আকর্ষণ হয়। এ বছরে তিনি দক্ষিণেশ্বরে না এসে থাকতে পারতেন না। এর পর থেকে দক্ষিণেশ্বরে হ'ল তাঁর আস্তানা।

১৮৮৫ সালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গলক্ষত হয়। কাশীপুরে বাগানবাটি ভাড়া করা হয় এবং রামকৃষ্ণকে নিয়ে আসা হয় এখানে চিকিৎসার জন্য। এখানে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট রবিবারে পরমহংসদেবের তিরোভাব ঘটে এবং তাঁর মরদেহ দাহ করা হয় বরানগর শ্মশান ঘাটে। তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে গৃহস্থভক্ত রামচন্দ্র কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে মন্দির নির্মাণ করেন এবং শশীমহারাজ চিতাভস্ম নিয়ে বেলুড়ে যান।

তিরোধানের অত্যল্পকাল আগে রামকৃষ্ণ তাঁর যোগসাধনায় লব্ধ আধ্যাত্মিক শক্তি নরেন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে গেলেন। অতঃপর অন্যান্য ভক্তগণসহ নরেন্দ্রনাথ কিছুদিন পরামাণিক ঘাটে মুনসিদের ভুতুড়ে বাড়ি ভাড়া করে বাস করেন এবং তারপর উঠে যান বরানগর মঠে। রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভক্তদের নিয়ে নিজ নেতৃত্বে নরেন্দ্রনাথ এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন করলেন এবং স্বয়ং বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করলেন।

ধর্মের বাণী ও কর্মের বাণী নিয়ে বিবেকানন্দ বার হলেন ভারতের দিকে দিকে পরিব্রাজক রূপে। ছ'বছর তিনি এভাবে প্রচার কার্য চালান।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো শহরে ধর্মসভা বসছে। সমস্ত ধর্মের প্রতিনিধিরা নিমন্ত্রিত। শুধু হিন্দুধর্মের কোন প্রতিনিধির কাছে নিমন্ত্রণ এল না। এ অপমান অনেক ভারতবাসীর বুকে বাজল। মাদ্রাজের কতিপয় ব্যক্তি ঐ ধর্মসভায় ভারতের

হিন্দুদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য পাঠালেন স্বামী বিবেকানন্দকে।

স্বামীজী বোম্বাই ত্যাগ করলেন এবং জাপান হয়ে চিকাগো চললেন। বিদেশ জায়গা। সবাই অজানা। ধর্মসভায় তিনি অনিমন্ত্রিত। কিন্তু ভারতের এই সন্ন্যাসীর বুকে সেদিন জ্বলছে আগুন। বাধা পুড়ে ছাঁই হয়ে গেল। অনেক চেষ্টার পর তিনি পাঁচ মিনিট বক্তৃতা দেবার অনুমতি পেলেন।

চিকাগোর ধর্মসভার বক্তৃতামঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। গৈরিক বসন, প্রশান্ত বদন, উন্নত উষ্ণীষ। আমেরিকার লোকেরা একটু চঞ্চল হ'ল। মঞ্চে তারা দেখল একজন বক্তা অপর বক্তাদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। মুখমণ্ডলে কি প্রশান্ত, গম্ভীর, উদার ভাব—ধারণা করা যায় না অথচ নীচু হয়ে আসে মাথা। মিষ্টি গলায় উদাত্ত আহ্বান এল—ভাই-ভগিনীগণ!

এত আপনার করে আর কেউ ত' ডাকেন নি তাদের। সবাই করেছেন নিজের ধর্মের বড়াই। ভারতের লোক, হিন্দুধর্মের লোক আপনার করে ডাকলেন সবাইকে। কি মধুর ডাক!

পাঁচ মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেল। শ্রোতারা আত্মহারা হয়ে শুনছেন বিবেকানন্দের বক্তৃতা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়। আমেরিকার লোকেরা বিবেকানন্দের বক্তৃতায় পাগল। অন্যান্য একঘেয়ে বক্তৃতা তাঁরা শুনতে চাইতেন না। ধর্মসভার অনুষ্ঠানে তাঁদের আগ্রহ রাখবার জন্য উদ্যোক্তারা বিবেকানন্দের বক্তৃতা সব শেষে দিতেন। তাঁর বক্তৃতার জন্য শ্রোতারা অগত্যা সভায় শেষ পর্যন্ত থাকতেন।

ভ্রান্ত ধারণায়, বিকৃত প্রচারে হিন্দুধর্ম প্রতীচ্যে ছিল অবহেলিত। বিশ্বধর্মসভায় সেই অবহেলিত, অনিমন্ত্রিত ধর্ম পেল শ্রেষ্ঠ আসন।

১৮৯৫ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত অর্থাৎ দুই বৎসর কাল স্বামীজী আমেরিকায় বাস করেন। তন্মধ্যে কয়েকবার ইংলণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণ করে আসেন। বহু পুরুষ ও মহিলা তাঁর শিষ্যত্ব

গ্রহণ করেন। তাঁর ইউরোপীয় শিষ্যগণের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা বিশেষ পরিচিতা।

১৯১১ সাল পর্যন্ত আমরণ তিনি ভারতের উন্নতির জন্য কাজ করেছেন। বাংলার তরুণ তরুণীদের স্বামীজীর পদানুসরণ করে পরাধীনতা, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার কালিমা ঘোচাবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতেন তিনি। বাংলার বিপ্লববাদের পিছনে নিবেদিতার উদ্দীপনা ছিল।

ইউরোপ ও আমেরিকায় আধ্যাত্মিক বিজয়লাভ করে স্বামীজী ফিরলেন দেশে। দেশের দরিদ্র, অবনমিত, পদদলিত মানুষের আর্তনাদ তাঁকে অনেকদিন আগেই বিচলিত করেছিল। এই নরনারায়ণের সেবাই হ'ল তাঁর ধর্ম, এই দরিদ্র মানুষ হ'ল তাঁর ভগবান। সাম্য হ'ল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। তিনি বলতেন—"আমি স্বীকার করিনা সেই ধর্ম ও ভগবান যা মুছাতে পারে না বিধবার চোখের জল, অনাথ শিশুর মুখে দিতে পারে না এক মুঠো ভাত!"

অস্পৃশ্যতা হিন্দুসমাজের কলঙ্ক। তিনি শোনালেন ভারতকে —"মুচী মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই!"

দেশের লোক চিনত না নিজের দেশকে। তিনি তাদের শোনালেন—ভারতের মাটি তোমার শৈশবের শিশু শয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী। মেয়েদের সামনে তিনি ধরলেন সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর আদর্শ। ভারতের শ্রমিকদের তিনি জানালেন প্রণাম। পদদলিত মানুষের সেবাই স্বামীজীর ধর্ম।

নরনারায়ণের সেবার জন্য তিনি খুললেন গুরুর নামে দুটো আশ্রম—বেলুড়ে একটি 'রামকৃষ্ণ মিশন' আর আলমোড়ার নিকট মায়াবতীতে 'রামকৃষ্ণ মিশন'। এই দুই আশ্রমে তিনি তৈরী করতে চাইলেন একদল সর্বস্বত্যাগী প্রচারক যারা গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে বয়ে নিয়ে যাবে শিক্ষার আলো। তিনি রাজনীতির উপর খুব বেশী ভরসা রাখতেন না। বলতেন—

"যতক্ষণ না ভারতের জনসাধারণ লেখাপড়া শিখছে, পেটপুরে খেতে পাচ্ছে, মানুষ হচ্ছে—ততক্ষণ কোন কাজে আসবে না রাজনীতি।"

দেশ ও দেশের মানুষের উপর ছিল তাঁর এত অটুট দরদ।

শ্রান্তিহীন পরিশ্রমে তাঁর বাল্যের ব্যাধি আবার চাড়া দিয়ে উঠে। হাওয়া বদলের জন্য তিনি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ইউরোপে যান এবং ফিরে আসেন পর বৎসর ডিসেম্বর মাসে। ফিরে এসে আবার তিনি দেশের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন কিন্তু বাল্যের ব্যাধি আর রেহাই দিলনা তাঁকে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন যোগসাধনার ফলে এক বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী। বিবেকানন্দ সেই শক্তিটুকু লাভ করেন রামকৃষ্ণের কাছ থেকে। সেই শক্তির বলে তিনি ভারতের যুগ-সাধনাকে নিয়ে এলেন এক নূতন পথে—আত্মবিশ্বাস, সংগ্রাম ও মুক্তির পথে।

পতিত মানবের মুক্তিকামনা হ'ল সেদিন থেকে ভারতের ধর্ম। শক্তির সাধনা শিখল ভারত। ভারতের পায়ের শিকল নড়ে উঠল। বাঙালী, মারাঠী, শিখের হাতে উঠল রিভলবার। ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল তাঁরা জীবনের জয়গান।

আসমুদ্র হিমাচল জেগে উঠল অহিংস নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীর জয়গানে। ইংরাজের কামান গোলার সামনে মরল ভারতের হাজার হাজার যীশু। ছিড়ল শিকল।

॥ তৃতীয় খণ্ড ॥

বাংলায় গণআন্দোলন ও বিপ্লববাদ

"তোমারা বলেছিলে রাজার রক্ত পবিত্র
কিন্তু এই দেখ,
আমার তরবারির গায় সে রক্ত লেগে আছে।"
—তাজিক কবি মুনাভারশা

[উদ্ধৃতি—"সোভিয়েট মধ্য এশিয়া"
—বিশ্ব বিশ্বাস।]

॥ এক ॥

বিংশ শতাব্দীর সূচনা

আন্দোলনে বিপ্লবের রূপ

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে শিক্ষিত বাঙালী পুরাতন কুসংস্কার ত্যাগ করল কিন্তু নূতন কুসংস্কারের বশ হয়। বেশভূষা, আহার-বিহারে এবং আচার-অনুষ্ঠানে ইংরাজের অন্ধ অনুকরণে বাঙালী সেদিন মত্ত। বাঙালীর সমাজে এল ইংরাজবণিকের সংস্পর্শে রুচিবিকৃতি, নীতিভ্রষ্টতা ও আধ্যাত্মিক সঙ্কট। ভূদেব, বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের প্রচারে এ সঙ্কট দূর হ'ল—এল বলিষ্ঠ স্বাদেশিকতার মহাপ্লাবন।

কংগ্রেসের সেদিন আবেদন নিবেদনের পথ।

পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের মত বাংলার এ পথ ভাল লাগছিল না।

তাঁর অন্তরে লেগেছে তখন স্বামী বিবেকানন্দের কম্বুনাদে শক্তির মন্ত্র। ঋষি বঙ্কিমের' 'আনন্দ মঠ' এর সশস্ত্র বিদ্রোহ ও গুপ্ত সমিতির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়েছে পথ নির্দেশ।

সাগরপারে পরাধীন মানুষদের সংগ্রামের কাহিনী ভেসে আসছে এপারে। ইতালীর স্বাধীনতার পূজারী ম্যাটসিনি, গারিবল্ডির মহান্ আদর্শ, আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তিকামী শহীদদের মরণজয়ী আত্মদান, অত্যাচারীর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিবার জন্য রাশিয়ার নিহিলিষ্টদের দুর্জয় সঙ্কল্প শোনে তারা—হয় চঞ্চল।

অত্যাচারী সাহেব হত্যা করে মারাঠাদেশে চাপেকার ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিলেন। আনন্দমঠের অনুকরণে বাংলার গ্রামে গ্রামে তৈরী হয় গুপ্ত সমিতি। মারাঠাদেশ থেকে বিপ্লববাদের কর্মপন্থা নিয়ে অরবিন্দ এলেন জন্মভূমি বঙ্গদেশে। আগুনের বাণী ছড়ালেন সর্বত্র।

বাঙালীর পায়ের চলার শব্দে আঁৎকে উঠে ইংরাজ রাজপুরুষরা।

ভারতের বড়লাট তখন লর্ড কার্জন। বাংলাকে পঙ্গু করবার জন্য তিনি বাংলাকে দুভাগ করবার পরিকল্পনা করলেন।

১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বাংলা দুভাগ হ'ল।

বাঙালীর প্রতিবাদের উত্তরে বড়লাট জানালেন—বঙ্গভঙ্গ রদ হতে পারে না। এ ঠিক হয়ে গেছে।

বাঙালীর নেতা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বললেন Surrender Not. তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বললেন—ঠিককে আমরা বেঠিক করবই।

সেদিন বিংশ শতাব্দীর সুরু। বিংশ শতাব্দীকে অভ্যর্থনা জানায় বাংলার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। কার্জনের দাম্ভিক নির্দেশের প্রতিবাদে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন অদমনীয় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের জনক রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যে বিগত অর্ধশতাব্দীর সংগ্রাম নিল বিপ্লবের রূপ।......

*　　　*　　　*

চলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ। চলে সরকারের নির্যাতন। সরকারের নিগ্রহে বাংলার তরুণদের চঞ্চল করল। গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়। অত্যাচারী কর্মচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র চলে।···

সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে কর্মচঞ্চল হয় বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি। সেদিন শিবাজীর দেশ মারাঠায় চলছিল সাগ্নিক মুক্তিযজ্ঞের আয়োজন।

গণপতি আন্দোলন ও শিবাজী উৎসবের মধ্য দিয়ে সেখানকার বিপ্লবাত্মক আয়োজন সুরু হয়।

বালগঙ্গাধর তিলক, দুই ভাই চাপেকার ও নাটুভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন সে আন্দোলনের নায়ক।

দামোদর চাপেকার ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন রাত্রে র‍্যাণ্ড ও আয়াষ্ট নামক দুজন অত্যাচারী সরকারী কর্মচারীকে নিহত করেন। ফাঁসির মঞ্চে তাঁরা প্রাণ দেন। ভারতের বিপ্লববাদের ইতিহাসে ইহাই প্রথম ফাঁসি।

সাগরপারের প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র ও নাগরিকদের মধ্যে এ সময় প্রচারিত হয় নানান সূত্রে বিপ্লববাদ। এই বিপ্লবের প্রধান উদ্যোক্তা হলেন কাথিয়াবাড়ের শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা আর ধনী পার্শি মহিলা ম্যাডাম কামা।

মারাঠাদেশে সেদিন চলছিল পূর্ণ স্বাধীনতার কামনায় বিপ্লববাদের কেন্দ্র। এই মারাঠা দেশেই বরোদার বৈপ্লবিক নেতা ঠাকুর সাহেবের নিকট বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন শ্রীঅরবিন্দ···

আনন্দমঠের অনুকরণে বাংলার শহরে ও গ্রামে তৈরী হয় বহু বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতি। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাস ও তারক পালিত প্রমুখ নেতাদের ছিল একটি দল।

রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র সংগঠিত 'হিন্দু-মেলা' ছিল বিপ্লববাদের আর একটি কেন্দ্র।

পরবর্তীকালে ব্যারিষ্টার পি. মিত্র স্থাপনা করেন "অনুশীলন সমিতি," বিপিন গাঙ্গুলী স্থাপনা করেন "আত্মোন্নতি সমিতি" আর অরবিন্দ, বারীন্দ্র স্থাপনা করেন 'যুগান্তর' দল।

এ ছাড়া শহরে শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় নানান্ নেতার নানান্ গুপ্তসমিতি।

বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট বিপ্লবীদল গুলোকে সংহত করেন শ্রীঅরবিন্দ।

বাংলা ভাগ হ'ল ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের আহ্বানে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলায় জাগল তীব্র গণ আন্দোলন।

সরকারী নিগ্রহ ও অত্যাচার হ'ল চূড়ান্ত।

বৈপ্লবিক সমিতি 'যুগান্তর' এর কাগজ 'যুগান্তর,' কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা,' মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নব শক্তি', আর অরবিন্দের ইংরাজী কাগজ 'বন্দে মাতরম্' জ্বলন্ত ভাষায় লিখতে লাগল সরকারের নিগ্রহ আর অনাচারের কথা।

জনসাধারণের মধ্যে জাগে প্রবল উদ্দীপনা।

বঙ্গভঙ্গের গণ আন্দোলনে সংগ্রাম বিপ্লবের মূর্তি ধারণ করে।

এই বিপ্লবের রূপকার শ্রীঅরবিন্দ।

পণ্ডিচেরী। সমুদ্রের নীল ঢেউ লাগছে তীরে। সেখানে যোগ-সাধনা করেছেন মানবপ্রেমিক বাঙালী সাধক শ্রীঅরবিন্দ। সে সাধনা তাঁর নিজের পারলৌকিক মুক্তির জন্য নয়, মৃত্যুর পর অক্ষয় স্বর্গলাভের কামনায় নয়, নির্বাণ ও মোক্ষের আশায় নয়! তাঁর সাধনা পৃথিবীর মানুষদের জন্য। দুর্গত, নিপীড়িত, কলুষিত মানবের জীবন-ধারা বদলে দিয়ে সত্য ও সুন্দর করতে তাঁর এ সাধনা। তাঁর সাধনায় তিনি তৈরী করতে চেয়েছেন কলুষিত বিশ্বে সুন্দর স্বর্গ।

একি সম্ভব? প্রশ্ন জাগে আমাদের মনে। যোগ-সাধনায় পৃথিবীর এ পরিবর্তন কি সম্ভব যা যুগ যুগ ধরে সম্যকরূপে কোন মনীষি পারেন নি। শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বাস ছিল যোগ বলে পৃথিবীকে বদলে দেওয়া যায়, বিশ্বকে করা যায় স্বর্গের মত সুন্দর।

অরবিন্দের পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন ভাগলপুরের সিভিল সার্জন।

তদানীন্তন বাংলার ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক এবং স্বাদেশিকতার প্রচারক বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী রাজনারায়ণ বসুর কন্যাকে ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে ডাঃ কৃষ্ণধনের চারিটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে—বিনয়কুমার, মনোমোহন, শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্র।

শ্রীঅরবিন্দের বয়স যখন সাত বৎসর তখন ডাঃ কৃষ্ণধন সপরিবারে বিলাত যাত্রা করেন। এই বিলাত যাত্রার সময় সমুদ্রের উপর জাহাজে বারীন্দ্রের জন্ম হয়। অরবিন্দের শিক্ষা বিলাতে। তাঁর পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ দানশীল ছিলেন এবং সংসার সম্বন্ধে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। বিদেশে বালক অরবিন্দকে পিতার এই ঔদাসীন্যের জন্য খুবই আর্থিক কষ্ট পেতে হয় কিন্তু তিনি ছিলেন কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী ও বিলাসিতার বিরোধী। তাই কোন অভাব তাঁর শিক্ষা জীবনে তাঁকে আঘাত দিতে পারে নি।

১৮৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হয়।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মাত্র তের বৎসর বয়সে তিনি লণ্ডনের সেণ্টপল স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বৃত্তিসহ তিনি কেমব্রিজের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। তৎপরে তিনি কিঙস্ কলেজে পড়তে থাকেন। ১৮৯২ সালে তিনি কেমব্রিজের ট্রিপস পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন।

ইতিমধ্যে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি আই, সি, এস পরীক্ষা দেন। উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে তিনি চতুর্থ স্থান লাভ করেন এবং গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার পরীক্ষায় তিনি প্রথম হন। ঐ দুই ভাষায় তিনি

যত নম্বর পান কেউ কোনদিন তত নম্বর পাননি। তবুও তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে মনোনিত হননি, কারণ অশ্বারোহণে তিনি নিপুণতা দেখাতে পারেন নি। শাপে বর হ'ল।

ম্যাজিষ্ট্রেট অরবিন্দের বদলে আমরা পেলাম নতুন অরবিন্দকে—ভারতের মুক্তির জন্য সংগ্রামী অরবিন্দ, বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য যোগী অরবিন্দ, পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ।

অরবিন্দের বড় ভাই বিনয়কুমার কুচবিহারের রাজসভায় কর্মে নিযুক্ত হন। অন্যতম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মনোমোহন প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের যশস্বী অধ্যাপক। তাঁর এক কন্যা লতিকা অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.।

শ্রীঅরবিন্দ বরোদার গাইকোয়াড়ের সাথে ফিরলেন ভারতে। বরোদা সরকারে তিনি চাকরী নিলেন। এর পর তিনি হলেন গাইকোয়াড়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি। শেষে তিনি বরোদা রাজ্যের শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন। বরোদায় তাঁর সুদীর্ঘ তের বৎসর অতিবাহিত হয়।

শ্রীঅরবিন্দ এই সময় প্রচুর বই পড়তেন। থাকতেন খুব সরল সাদাসিদে ভাবে সামান্য একটা বাড়িতে। তিনি ছিলেন গাই-কোয়াড়ের প্রিয় পাত্র। ইচ্ছা করলে তিনি গাইকোয়াড়ে রাজার হালে থাকতে পারতেন।

মশারির মধ্যে বসে তিনি পড়তে ভালবাসতেন না। মশারির বাইরে বসে তিনি পড়ে যেতেন বই এর পর বই—বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই। মশাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। ইতিমধ্যে তিনি বিবাহ করেন ভূপাল বসুর কন্যা শ্রীমতী মৃণালিনীদেবীকে। এই সাধ্বী রমণী ১৯১৮ সনে পরলোক গমন করেন।

সংসারের উপর নিবিড় টান অরবিন্দের কোন দিনই ছিল না।

তবে মাকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসতেন। বরোদায় থাকতে তিনি মা ও বোনকে নিয়মিত টাকা পাঠাতেন।

বাল্যে শ্রীঅরবিন্দ বাংলা জানতেন না। তাঁর মামা যোগীন্দ্রনাথ বসু সুপরিচিত লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায়কে বরোদায় পাঠান অরবিন্দকে বাংলা শেখাবার জন্য। অরবিন্দ তাঁর কাছে বাংলা শেখেন।

অরবিন্দ যখন প্রবাসে ছিলেন তখন বাংলায় কি ঘটছিল তা আমাদের জানা দরকার।

রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার ও সমাজসংস্কার বাংলার বুকে নিয়ে এল বিপ্লবের বান। পাশ্চাত্য সভ্যতার জোয়ারে এল উচ্ছৃঙ্খলতা আর সাহেবি-ফ্যাসান। ভূদেব, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির প্রাচ্য সুনীতি ও সংস্কৃতির আবেদনে তার মোড় ফিরল।

...সিপাহী বিদ্রোহের পর বাংলার নীল চাষীরা লড়াই করল শোষক নীলকর সাহেবদের সাথে। শোষিত নিপীড়িত চাষীদের ব্যথা ও বেদনা শিক্ষিত বাঙালীর প্রাণে নূতন তরঙ্গের ঢেউ তুলল। নূতন জীবন পেল বাংলা।

হেম, মধু, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, নবীন ও রঙ্গলালের লেখনীতে আর দেবেন ঠাকুর, কেশব সেন ও পরমহংস দেবের ধর্ম বাণীতে বাঙালীর একতারাতে বেজে উঠল নূতন সুর।

এল স্বাদেশিকতা ও স্বদেশীভাব। সাহেবদের বুটের লাথি আর বাঙালীর সহ্য হয় না।

স্বদেশী দ্রব্য প্রচার ও শক্তি চর্চার আন্দোলন আরম্ভ হল।

জন্ম নিল সুরেন্দ্রনাথের 'ভারত সভা'—সারা ভারত ব্যাপী সংগঠন।

সাহেবরা আর সাহেব-ঘেষা লোকরা পাল্টা তৈরী করল 'কংগ্রেস'। কংগ্রেসকে জনপ্রিয় করবার জন্য কংগ্রেসের পাণ্ডারা 'ভারত-সভা'র নেতাদের আনলেন কংগ্রেসে। বিপিন পাল,

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী তুললেন কংগ্রেসে আসামের চা-মজুরদের নিপীড়নের কথা।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পাকা সংগঠনে কংগ্রেসকে বড় করলেন। আরও অনেক বাঙালীর মাথা কংগ্রেসকে দিচ্ছিল নূতন রূপ। কংগ্রেস কিন্তু চল্‌ছিল সেদিন আবেদন-নিবেদনের পথে।

বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের কিন্তু এসব ভাল লাগছিল না। সম্মুখে তাদের "ঋষি বঙ্কিমের" 'আনন্দ মঠ'—মুক্তি-সংগ্রামের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। অন্তরে তখন উঠেছে বিবেকানন্দের কম্বুনাদ,—আত্মশক্তির উদ্বোধন। সাগরপারের পরাধীন মনুষদের সংগ্রামের কাহিনী ভেসে আসছে এপারে। ইতালীর স্বাধীনতার পূজারী ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডির মহান আদর্শ, আয়াল্যাণ্ডের মুক্তিকামী শহীদদের মরণজয়ী আত্মদান। অত্যাচারীর অত্যাচারের শোধ নেবার জন্য রাশিয়ার নিহিলিষ্টদের দুর্জয় সঙ্কল্প শোনে তারা—হয় চঞ্চল। বাংলার গ্রামে গ্রামে তৈরী হতে লাগল আনন্দমঠের অনুকরণে গুপ্ত সমিতি। বিবেকানন্দের বাণী বাঙালীর মরণ ভয় দূর করে।

মারাঠী চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্ত শাদার রক্তে রঞ্জিত হয়। তাঁরা চুম্বন করলেন অত্যাচারীর ফাঁসিকাঠ।

আর আবেদন নিবেদন নয়। এবার সংগ্রাম।

তরুণদের মনে জাগল দুর্জয় সঙ্কল্প।

সুদূর মারাঠা দেশে অরবিন্দ সেদিন বই-এর পাহাড়ের মধ্যে আছেন। কানে ভেসে এল তাঁর এই নব জীবনের ক্রন্দন। মুখ তুলে চাইলেন তিনি নিজের জন্মভূমি বাংলা দেশের দিকে। আনন্দমঠ আর বিবেকানন্দের বাণীতে আগুন লেগেছে সে দেশে কিন্তু সে আগুন জ্বলছে সমাজের উচ্চস্তরে···নিম্নস্তরে সে আগুন জ্বলছে না।

তিনি বললেন—Wanted more repression. আরও অত্যাচার চাই। বাংলার ঘরে ঘরে ইংরাজের ব্যাটন চলবে তবে ঐ

আগুন লাগবে ঘরে ঘরে। তিনি এলেন ছোট ভাই বারীন্দ্রকে সঙ্গে করে বাংলায়।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের কথা। দু'বছর তিনি ঘুরলেন বাংলার জেলায় জেলায়। গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার সুযোগ ও সম্ভাবনা দেখে তিনি ঘুরে বেড়ালেন বাংলার সর্বত্র। বিচ্ছিন্ন গুপ্তসমিতি গুলো এক করবার কথা তিনি ভাবলেন।

একাজে ব্রতী হলেন তাঁরই নির্দেশে তাঁর ছোট ভাই বারীন ঘোষ।

বাংলায় বিপ্লববাদের দানা বাঁধে। সেই বিপ্লববাদের ঋষি শ্রীঅরবিন্দ।

বাঙালীর পায়ের চলার শব্দে আঁৎকে উঠে ইংরাজ-রাজপুরুষেরা।

ভারতের বড় লাট তখন লর্ড কার্জন। বাংলাকে পঙ্গু করবার জন্য তিনি বাংলাকে দুভাগ করবার পরিকল্পনা করলেন।

১৯০৫ সনের ১৬ই অকটোবর বাংলা দুভাগ হ'ল।

বঙ্গভঙ্গের ব্যথা বাংলার বুকে এক দারুণ বিপ্লব আনল।

বাঙালী বিলাতী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন করে ইংরাজকে দিতে চাইল আঘাত। কংগ্রেস তা সমর্থন করল না। বাঙালী একাই চলল তার সংগ্রামের পথে।

রাস্তায় রাস্তায় চলল বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব। বাংলায় বিপ্লব-বাদ পেল কর্মের সুযোগ।

বারীন ঘোষ বার করলেন 'যুগান্তর' কাগজ। এই কাগজের আড্ডায় বাংলার বিচ্ছিন্ন গুপ্তসমিতিগুলো মিলিত হ'ল। বোমা আর পিস্তল দিয়ে দেশোদ্ধার করতে হবে এই হ'ল তাদের পণ।

১৯০৬ সাল।

বাংলায় সুরু হ'ল সরকারের নির্যাতন। বিপ্লবীরাও প্রতিশোধ নেবার জন্য ছুটলেন বোমা আর রিভলবার হাতে। পূর্ববঙ্গের লাট

ফুলার আর পশ্চিমবঙ্গের লাট ফ্রেজার বধের আয়োজন হ'ল। কিন্তু বিপ্লবীরা সফল হ'ল না।

১৯০৭ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় বার হ'ল ইংরাজী দৈনিক 'বন্দেমাতরম্'। তিনি কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের তীব্র নিন্দা করতে লাগলেন এবং নবজাগ্রত সংগ্রামী শক্তিকে আবাহন জানালেন।

কংগ্রেস দুটো দলে বিভক্ত হল—'নরম পন্থী' ও 'গরমপন্থী'। এই গরমপন্থী দলের অন্যতম নায়ক শ্রীঅরবিন্দ।

ছাত্রদের উপর আরম্ভ হ'ল সবচেয়ে চরম নির্যাতন। আন্দোলনে যোগদানকারী ছাত্রদের প্রকাশ্য আদালতে বেত মারা হ'ত, স্কুল কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ত।

ছাত্রদের জন্য স্থাপিত হ'ল জাতীয় বিদ্যালয়। এই জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন শ্রীঅরবিন্দ।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেব আন্দোলনকারী ছেলেদের প্রকাশ্য আদালতে বেত মারবার আদেশ দিতেন।

কলকাতার কেন্দ্রীয় গুপ্তসমিতি কিংসফোর্ড সাহেবের বিচারের ভার দিলেন শ্রীঅরবিন্দ ও অপর দুজন নেতার উপর। বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়।

কিংসফোর্ড তখন মজঃফরপুরে। কেন্দ্রীয় গুপ্তসমিতির নির্বাচিত ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী কিংসফোর্ড সাহেবকে মারতে চললেন। কিংসফোর্ড সাহেরের গাড়ী মনে করে তারা দুজন নিরীহ মেমসাহেবকে মারলেন। পুলিশ বাংলার বিপ্লবীদের সহিত সংশ্লিষ্ট সমস্ত লোককে ধরে ফেলল।

অরবিন্দও বাদ গেলেন না। হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ তাঁকে নিয়ে ভ্যানে তুলল।

সে অপমান বাঙালী কোনদিন ভোলে নি। দীর্ঘ বিনিদ্র রজনীর তপস্যায় তাই ত তার দ্বারে এসে পৌঁছাল স্বাধীনতার আলো।

১৯০৮ সালের ২রা মে অরবিন্দ ধরা পড়লেন এবং দীর্ঘ এক বৎসর কারাবাসের পর তিনি আলিপুর বোমার মামলায় প্রমাণাভাবে খালাস পান। এই মামলার বিচারক জজ বিচক্রিফট আই, সি, এস, অরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন। আর ভাগ্যের পরিহাসে সেদিন তাঁর চেয়েও কৃতী সতীর্থ তাঁরই সামনে কাঠগড়ার আসামী।

নির্জন কারাবাসে তিনি যোগ-সাধনা অভ্যাস করেন। মুক্তির পর তিনি রাজনীতিতে আবার নামলেন কিন্তু তাঁর রাজনীতি গরম-পন্থী।

রাজনীতিতে তখন গরমপন্থীর স্থান ছিল না। বাংলার সংগ্রামী শক্তি তখন প্রাচীরের অন্তরালে। অত্যাচারে অত্যাচারে ঝিমিয়ে এসেছে সংগ্রাম।

আবেদন নিবেদনের থালা যাঁরা বইতে পারছেন রাজনীতির আসরে তাঁরাই তখন প্রবল। এ রাজনীতি তাঁর ধাতে সইল না।

এ মোড় ঘোরাবার জন্য ১৯০৯ সনের মে মাস থেকে ১৯১০ সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত প্রায় এক বছর তিনি ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। বিফল হয়ে তিনি যোগ-সাধনার পথ ধরলেন—যা তিনি কারাবাসের সময় অভ্যাস করতেন।

তিনি প্রকাশ করেন বাংলা সাপ্তাহিক 'ধর্ম' ও ইংরাজী সাপ্তাহিক 'কর্ম যোগিন'। তিনি নূতন দর্শন, নূতন পথের সন্ধান দিতে লাগলেন তাঁর লেখায়। তাঁর ধারণা হ'ল যোগ-সাধনায় নিজের দেশের ত বটে, সারা পৃথিবীর সত্য ও সুন্দর রূপান্তর ঘটান যায়। যোগ সাধনার জন্য তিনি যান মাদ্রাজের উপকূলে ফরাসী অধিকৃত বন্দর পণ্ডিচোরীতে।

পণ্ডিচেরী তাঁর নূতন দর্শন ও নূতন কর্মযোগের সাধন ক্ষেত্র।

তাঁর সাধনার প্রথম জীবনে একজন ফরাসী পুরুষ ও ফরাসী নারী তাঁর সঙ্গ নেন। মঁসিয়ে পল রিসার, মিসেস রিসার তাঁদের নাম। তাঁদের সহযোগিতায় তিনি পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে বার করতেন 'আর্য' পত্রিকা। আর্য পত্রিকার ফরাসী সংস্করণও প্রকাশিত হত। আজ সে কাগজ আর প্রকাশিত হয় না। অরবিন্দ আজ পরলোকে। পল রিসার আজ আর পণ্ডিচেরীতে নাই। আছেন ফরাসী নারী মিসেস্ রিসার— শ্রীমা মীরা। শ্রীমা মীরা আজ পণ্ডিচেরীর মা— বাঙ্‌লার মা, সবার মা।

হিংসা কলুষিত, রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বে মত্ত বিশ্বে কল্যাণময় সমাজের আশ্বাস দিয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের সাধনা। পীড়িত মানব গভীর ভরসা নিয়ে চেয়েছিল নীলাম্বুর পানে। কান পেতে ছিল তাল তমাল নারিকেল শাখার পবনে কোন ভাষা উঠে পৃথিবীর অঙ্গনে।

শ্রীঅরবিন্দের তিরোভাবে পীড়িত মানবের আশা আজ ব্যর্থ।

কাল অন্ধকারের অন্তরালে লোভ হিংসার দানব মাথা তুলছে আবার। ঝড়ের আওয়াজ দিকে দিকে।

॥ দুই ॥

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫)
ও *বাংলায় বিপ্লববাদ*

বাঙালীর পায়ের চলার শব্দে আঁৎকে উঠেন ইংরাজ রাজপুরুষগণ। ভারতের বড়লাট তখন লর্ড কার্জন। বাংলাকে পঙ্গু করবার জন্য তিনি বাংলাকে দুভাগ করবার পরিকল্পনা করলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর—বাংলা ৩০শে আশ্বিন, ১৩১২ সাল। ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভাগের আদেশ দেন।

১৯০৫ সালের পূর্বে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর নিয়ে

ছিল সুবৃহৎ বাংলাদেশ। বাংলার জনমত উপেক্ষা করে কার্জন বঙ্গভঙ্গের আদেশ দিলেন।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী বিভাগ এবং আসাম নিয়ে গঠিত হল পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ। আর বিহার-উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, প্রেসিডেন্সী বিভাগ ও বর্ধমান বিভাগ নিয়ে গঠিত হ'ল বঙ্গদেশ। 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের রাজধানী হ'ল ঢাকা।

ভারতের রাজধানী যেমন ছিল কলকাতায় তেমনি রয়ে গেল। আর কলকাতায় বেলভেডিয়ারে রয়ে গেল বড়লাটের আবাস।

বঙ্গভঙ্গ রদ করবার জন্ম বিপ্লবীরা খুঁজতে লাগল সংগ্রাম করবার পথ।

আমেরিকা প্রবাসী চৈনিকদের বিরুদ্ধে এ সময় আমেরিকা সরকার এক আইন প্রণয়ন করেন। এর প্রতিবাদে ডাঃ সান ইয়াত চীনে আমেরিকার পণ্য বর্জন আন্দোলন সুরু করেন। এই দৃষ্টান্ত বাঙালীর চোখ খুলে দিল।

"সঞ্জীবনী" পত্রিকায় কৃষ্ণকুমার মিত্র বিলাতী পণ্য বর্জন আন্দোলন সুরু করবার প্রস্তাব দিলেন। সারা বাংলা দেশে পড়ে গেল বিলাতী পণ্য-বর্জনের সাড়া।

স্বদেশ-প্রাণ ব্যবসায়ীরা দেশী কাপড় আমদানী করল। কলেজের ছেলেরা ঘাড়ে ক'রে দেশী কাপড় বিক্রী করে আর গান গায়—

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে, ভাই।'

ভীরু কংগ্রেস বিলাতী-বর্জন আন্দোলন সনর্থন করল না।

বিলাতী বর্জনের বদলে স্বদেশী গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল বারাণসী অধিবেশনে। বাঙালী একাই চলল সংগ্রামের পথে।

বিলাতী বর্জনের সাথে তরুণরা বহ্ন্যুৎসব সুরু করল।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে এ আন্দোলন জোরালো হ'ল। গোলদীঘিতে এক বহ্ন্যুৎসবে ষোল সের কেরোসিন পোড়ে আর সময় লাগে আড়াই ঘণ্টা।

বিলাতী কাপড় পুড়ে হ'ল ছাই।

এই সময়ে বসল বরিশালে বাংলা কংগ্রেসের অধিবেশন। সরকার সহরে সর্বপ্রকার শোভাযাত্রা ও "বন্দেমাতরম" ধ্বনি নিষিদ্ধ ক'রল। বাংলার জনসাধারণ এ আদেশ মানল না। নেতারা সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে প্রকাশ্য রাজপথে "বন্দেমাতরম" ধ্বনির সঙ্গে ১০ই মার্চ প্রাতে (১৯০৬) শোভাযাত্রা বার করলেন। সুরেন্দ্রনাথ পুলিশের হাতে বন্দী হলেন।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখ বাংলা ৩০শে আশ্বিন, বাংলা দুভাগ হ'ল।

১৯০৬ সনের উক্ত দিবসে বাংলার অংগচ্ছেদ দিবস পালনের আবেদন জানালেন রোগশয্যা থেকে বাংলার বিজ্ঞ ও সুধী নেতা আনন্দমোহন বসু।

সেদিন কারো ঘরে উনুন জ্বলল না।

সেদিন হ'ল সারা বাংলার 'অরন্ধন দিবস'। দিকে দিকে সেদিন অনুষ্ঠিত হ'ল প্রতিবাদ সভা। সভায় চাঁদা তোলা হ'ল।

এই চাঁদায় স্থাপিত হ'ল জাতীয় ধন-ভাণ্ডার। সেই টাকায় অখণ্ড বংগ-ভবন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হ'ল। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের কাছে স্থাপিত হ'ল মিলন মন্দিরের ভিৎ।

তরুণদের পিছনে এসে দাঁড়াল বাংলার ছাত্রদল। তারা বিলাতী কাপড়ের দোকানের সামনে পিকেটিং করে।

কলকাতার বড়বাজারে পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ হয়। শিক্ষা-বিভাগের কর্তারা ঘোষণা করলেন, আন্দোলনে যোগদানকারী ছাত্রদের স্কুল কলেজ থেকে বার ক'রে দেওয়া হ'ক।

চারিদিকে হ'তে লাগল ছাত্রদের নিগ্রহ।

নিগ্রহ চরমে উঠল মাদারীপুরে। ছোটলাট ফুলারকে অসম্মান করবার কল্পিত অপরাধে মাদারীপুরের কতিপয় ছাত্রকে ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বিদ্যালয় হ'তে বিতাড়িত করেন। প্রতিবাদে প্রধান শিক্ষক কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত চাকুরী ত্যাগ করেন।

শিক্ষাবিভাগের ছাত্রনিগ্রহের সারকুলারের বিরোধী সমিতি গঠিত হ'ল এবং জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল।

জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা দান করেন। কলকাতার জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হ'লেন শ্রীঅরবিন্দ।

কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী', ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম', 'যুগান্তর' প্রভৃতি সংবাদপত্র জ্বলন্ত ভাষায় লিখতে লাগল সরকারের নিগ্রহ আর অনাচারের কথা।

একটি প্রবন্ধের জন্য ব্রহ্মবান্ধবের জেল হ'ল। জেলের হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এতে জনসাধারণের উদ্দীপনা আরও বৃদ্ধি পায়।

সরকারের রোষ পড়ল সংবাদপত্রের উপর। "যুগান্তর" পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি বৈপ্লবিক লেখার জন্য সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এক বৎসর কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় "ভারতবাসীর জন্য ভারত" নামক একটি ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় বিপিন পাল পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন।

বিপিন পালের মামলা সুরু হ'ল কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবের আদালতে।

কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত।

কাটগড়ায় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা বিপিন পাল। বিদেশীর হাতে প্রিয়তম নেতার এই বিচারের প্রহসন দেখবার জন্য কাতারে কাতারে লোক আদালতে জমায়েত হয়।

আদালতের প্রাংগন লোকে লোকারণ্য। ভিড় সরাবার জন্য

পুলিশ লাঠি চালায়। মার খেয়ে জনতা হটে যায় কিন্তু একটি কিশোর বালক হটল না। সে নীরবে সাহেবদের অপমান হজম করল না। প্রহরারত গোরা হেনরীকে সে পাল্টা আক্রমণ করল।

কিশোরের নাম সুশীল সেন।

কিশোর বালক সুশীল সেনের উদ্যত হাতে পড়ল হাতকড়ি।

আবার সেই প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত। বিচারক কুখ্যাত কিংসফোর্ড সাহেব।

আসামী চৌদ্দ বছরের ছোট ছেলে সুশীল। বিচারে চৌদ্দ ঘা বেতমারার আদেশ হ'ল। ইংরাজ জল্লাদের হাতের পুরু, লম্বা, কঠিন বেতের এক একটি ঘা বালকের পিঠে পড়ে। পিঠে কাল দাগ পড়ে যায়, চামড়া কেটে রক্ত পড়ে। তবু বালকের বুক কাঁপে না।

কেন কাঁপবে? সে যে জানে নিজদেশে পরবাসী দেশবাসীর উদ্ধারের জন্য যুগে যুগে দেশে দেশে যারা দিয়েছে বুকের রক্তের আহুতি তাদের-ই পিঠে যুগ যুগান্তরে ভেঙেছে বিদেশীর হাতের নির্মম বেত।

বীভৎস বিচারে বেত্রাহত আর্ত শিশুর বুকে বল দেবার জন্য তার দেশের কবি কাব্য বিশারদ তাইত' গেয়েছেন—

'বেত মেরে কি মা ভুলাবি,
আমরা কি মা'র সেই ছেলে?'

কাঁপে না সুশীলের বুক। রক্ত কাতর পিঠ, তবু কাঁদে না সে। সে ছুটে আসে বিপ্লবীদের আস্তানায়, নিজের প্রাণ দিয়ে কিংসফোর্ডর রক্ত চায়। বিপ্লবীরাও হ'ল একমত। বিদেশী বিচারকের ভার তারা নিজের হাতে নিতে চায়।

বাংলা ভাগ হয় ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর।

ঠিক ছ মাস পর অরবিন্দ-বারীন ঘোষের বিপ্লবীদল চাঁপাতলায় মেডিক্যাল কলেজের দক্ষিণে আস্তানা স্থাপন করলেন। চাঁপাতলায়

আস্তানা ছিল দেড় বছর—১৯০৬ সনের মার্চ মাস থেকে ১৯০৭ সনের অক্‌টোবর পর্যন্ত।

বিপ্লবীদের আস্তানা এ সময় চাঁপাতলা থেকে উঠে এসেছে মানিকতলায় মুরারীপুকুর রোডে বারীন ঘোষের নিজস্ব বাগান বাড়িতে। গত দেড় বৎসর চাঁপাতলায় বিপ্লবীদের আস্তানা ও 'যুগান্তর' আপিস একসঙ্গে ছিল। এবার হাতে-কলমে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সুরু করার জন্য বিপ্লবীরা মানিকতলা বাগানে পৃথক আস্তানা করলেন। মানিকতলা বাগানে বিপ্লবীদের অবস্থিতি মাত্র ছ'মাসের জন্য—১৯০৮ সনের মে'র প্রারম্ভ পর্যন্ত।

মানিকতলা বাগান হ'ল বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার আড্ডা। মেদিনীপুরের উদ্যোগী কর্মী হেমচন্দ্র কানুনগো নিজের বাড়ি-ঘর-দোর বিক্রি করে জার্মানে যান বোমা তৈরি শিখবার জন্য এবং ফিরে এসে এই আড্ডায় যোগদান করেন। হেমচন্দ্রের হাতে তৈরি হয় বোমা।

এই আস্তানা থেকে সুরু হয় বাংলায় প্রথম বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা—পশ্চিমবঙ্গের লাট ফ্রেজার বধের তিনবার চেষ্টা, গোয়ালন্দে ঢাকার প্রাক্তন ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন সাহেবের উপর আক্রমণ, কুষ্টিয়ায় পাদরি রেভাঃ হিকেনের উপর আক্রমণ, চন্দননগরে মেয়রের উপর আক্রমণ এবং সর্বশেষে কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা। দুর্গম বিপ্লব পথে বাঙালীর অভিযান সুরু হয়।

॥ তিন ॥

বাংলায় প্রথম বিপ্লব প্রচেষ্টা

কিংসফোর্ড হত্যার প্রয়াস ও ক্ষুদিরামের ফাঁসি

১৯০৮ সনের এপ্রিল মাসে বিপ্লবীদের গুপ্তচক্রের বৈঠকে নেতাদের আদেশে কিংসফোর্ড সাহেবের উপর মৃত্যুদণ্ড স্থির হল। কিংসফোর্ড সাহেব তখন কলকাতা থেকে বদলি হয়েছেন। তিনি তখন মজঃফরপুরের জেলা জজ।

কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য পরস্পর অপরিচিত দুজন কর্মীকে মজঃফরপুর পাঠান স্থির হ'ল। বিপ্লবীদল দুজন নায়ক কলকাতার বারীন ঘোষ ও মেদিনীপুরের সত্যেন বসুর উপর পড়ল কর্মী নির্বাচনের ভার। বারীন ঘোষ তাঁর দীক্ষিত রংপুরের প্রফুল্ল চাকীকে এবং সত্যেন বসু তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য মেদিনীপুরের তরুণ কিশোর ক্ষুদিরাম বসুকে নির্বাচন করলেন।

প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম পরস্পর পরস্পরকে চিনতেন না কিংবা পরস্পর পরস্পরের নামও জানতেন না। প্রফুল্ল চাকীর ছদ্মনাম দীনেশ এবং ক্ষুদিরামের ছদ্মনাম দুর্গাদাস। এই নামে তাঁরা হলেন পরস্পর পরস্পরের পরিচিত। দুজনায় চললেন মজঃফরপুর—সঙ্গে বোমা, রিভলবার। মজঃফরপুরে তাঁরা ধর্মশালায় আশ্রয় নিলেন। তাঁরা প্রতিদিন কিংসফোর্ডের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখতেন। এর ফলে তাঁরা জানলেন যে কিংসফোর্ড সাহেব প্রতিদিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় ক্লাব থেকে নিজের ঘোড়ার গাড়িতে বাংলোয় ফেরেন।

*   *   *

৩০শে এপ্রিল (১৯০৮); সন্ধ্যাবেলা।

কিংসফোর্ড সাহেবের বাংলোর সামনে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন দুই কিশোর বিপ্লবী—হাতে বোমা, কোমরে রিভলবার।

সহসা অদূরে কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ির খট্ খট্ আওয়াজ।

তড়িৎবেগে বিপ্লবীরা প্রস্তুত হন। গাড়ির উপর বোমা ফেলে তাঁরা পরস্পর বিপরীত দিকে প্রস্থান করেন।

সৌভাগ্যবান কিংসফোর্ড সে গাড়িতে ছিলেন না—ছিলেন ব্যারিষ্টার কেনেডির পত্নী ও কন্যা। তাঁরা প্রাণ হারালেন।

* * *

অন্ধকার রাত্রি। বিদেশ। অচেনা পথ-ঘাট, অন্ধকার পথ। সারারাত্রি পথ হেঁটে চলেছেন ক্ষুদিরাম। পথশ্রমে পরিশ্রান্ত···শুষ্ক মুখ। সারা রাত পথ হাঁটলেন। রাত ভোর হ'ল।

বেলা বাড়ে। ক্ষুদিরাম ওয়াইনি স্টেশনের নিকটে একটি দোকানে এসে বসে পড়লেন। গুড়মুড়ি খেয়ে জলপান করছেন—এমন সময় স্টেশনের পাহারাদার সাদাপোষাকপরা পুলিশ সন্দেহ-বশতঃ তাঁকে গ্রেফ্তার করল।

গুপ্তসমিতির খবরাখবর জানবার জন্য পুলিশ তাঁর উপর অসীম নির্যাতন করল। ক্ষুদিরাম আদর্শ বিপ্লবী। তাঁর কাছ থেকে একটি কথাও বার হ'ল না।

এগার-ই আগষ্ট (১৯০৮)। শ্রাবণ মাস। বাংলার আকাশে বর্ষা অঝোরে চোখের জল ফেলে বাংলার মাঠ, ঘাট, বাটে। সেদিন লাঞ্ছিতা বঙ্গজননীর চোখের জল মুছে দেবার বক্শিস্ নিচ্ছিলেন মজঃফরপুরের কারাগারে ফাঁসির মঞ্চে কিশোর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম।

শোকে উথলে উঠল গণ্ডকী নদীর জল। গণ্ডকীর বালুচরে ক্ষুদিরামের দেহ ভস্মীভূত হয়।

গ্রাম গ্রামান্তরে বাংলার মাঠে প্রান্তরে সেদিন খেয়ালী বাউলের কণ্ঠে যে গানের সূত্রপাত হয় তা আজও বাঙালীর ঘরে ঘরে কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হয়—

একবার বিদায় দে, মা, ঘুরে আসি—

ক্ষুদিরামের হ'বে ফাঁসি।

*　　　　*　　　　*

আর প্রফুল্ল। প্রফুল্ল তখন কোথায়?

১লা মে-১৯০৮। মোকামাঘাটের স্টেশনের প্লাটফর্মের সিমেন্টের উপর তাঁর জীবন নাট্যের যবনিকাপাত হয়!

প্রফুল্ল চাকী ক্ষুদিরামের মত খেয়ালী ছিলেন না। তাঁর বয়স ছিল আরও কম। প্রফুল্ল সতর বছর বয়সের কিশোর। তিনি সোজা ট্রেনে চেপে সেদিনই রাত্রির অন্ধকারে কলকাতার পথে রওনা হলেন।

মাঝে সমস্তিপুর স্টেশন। এখানে ট্রেন বদল করতে হয়। সমস্তিপুর স্টেশনে প্রফুল্ল জামা কাপড় বদল করছেন। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক সি, আই, ডি ইনস্‌পেকটরের চোখে পড়ল তা। তিনি প্রফুল্লের পিছু নিলেন।

ট্রেন আবার চলে। নন্দলাল প্রফুল্ল চাকীর কামরায় উঠে তাঁর সঙ্গে ভাব করেন। মোকামাঘাটে নেমে প্রফুল্ল চাকী দেখলেন একদল পুলিশ নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তাঁকে গ্রেফ্‌তার করতে উদ্যত।

পুলিশের হাতে আত্মসমর্পন করা হেয় মনে করলেন প্রফুল্ল চাকী। কোমরের রিভলবার মুখের মধ্যে পুরে তিনি ছুড়লেন গুলি। বিপ্লবীর জীবন্ত দেহ স্বদেশীয় বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহীর স্পর্শের যে কত উপরে তা দেখিয়ে তিনি বীরের মত মৃত্যু বরণ করলেন।

…মোকামাঘাট স্টেশনের প্লাটফর্ম—বাঙালীর তীর্থ, স্বাধীন

ভারতের মুক্তির পীঠস্থান। বাংলার প্রথম শহীদের তুহিন শীতল দেহের স্পর্শে কেঁদে উঠেছিল একদিন এখানকার সিমেণ্ট—কিন্তু কাঁপেনি ইংরাজের পদলেহী বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচরের প্রাণ। বিশ্বাসঘাতকতার যে শিক্ষা পলাশীর মাঠে আমরা পাই সেই শিক্ষা আবার আমরা সেদিন পেলাম মোকামাঘাটের প্লাটফর্মে। সেদিন সিরাজ পরাজিত, মীরজাফর মাথায় পরেছেন রাজমুকুট। এদিন পয়লা মে (১৯০৮) সেই গঙ্গার তীরেই প্রফুল্ল চাকী মরলেন—আর পুরস্কার পেলেন নন্দলাল।

কিন্তু ইতিহাসের পাতায় এটাই কি সত্য! বিপরীত কি সত্য কিছুই নাই ?

আছে। দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের কোনদিন কেউ রেহাই দেয়নি। বিপ্লবীদের উদ্ধত অগ্নিনালিকার মুখে বিশ্বাসঘাতকতার জবাব এসেছে—ক্ষমা নেই।

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও পান নি ক্ষমা।

মাত্র চার মাস পর তিনি পেলেন জবাব।

১৯০৮ সনের ৯ই নভেম্বর মাসের এক সন্ধ্যা। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কেরাণীবাগানের বাসা থেকে বার হয়ে চলেছেন এক বন্ধুর বাড়িতে নিজের আসন্ন বিবাহের সংবাদ নিয়ে। বৌবাজার আর সারপেনটাইন লেনের মোড়ে আসতেই তাঁর বুকে লাগে··· গুলির পর গুলি। নিহত নন্দলালের রক্তে প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়ে অজ্ঞাতনামা জনৈক বিপ্লবী অন্তর্হিত হলেন।

১৯০৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিন আর এক বিশ্বাসঘাতক পেলেন বিশ্বাসঘাতকতার জবাব। তিনি আলিপুর বোমার মামলায় (১৯শে মে, ১৯০৮—১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৮) রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই। শ্রীরামপুর (হুগলী) এর ধনী গোস্বামী পরিবারের কুসন্তান সুদর্শন তরুণ যুবক নরেন গোঁসাই। আলিপুর জেলের হাসপাতালে

এই বিশ্বাসঘাতককে রিভলবারের গুলিতে নিহত করেন চন্দননগরের কানাই দত্ত ও মেদিনীপুরের সত্যেন বসু।

বিপ্লববাদের ইতিহাসে এ এক অপূর্ব রোমাঞ্চকর ঘটনা।

* * *

রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই হত্যা ও কানাই-সত্যেনের ফাঁসি

২রা মে, ১৯০৮।

মজঃফরপুরের ঘটনার (৩০শে এপ্রিল, ১৯০৮) পর ২রা মে (১৯০৮) ভোর রাত্রে সশস্ত্র পুলিশ ঘেরাও করল মানিকতলার বারীন ঘোষের বাগান বাড়ি। বিপ্লবী কর্মীদের হাতে পড়ল হাতকড়ি। ঐ বাড়িতে যত রিভলবার, বন্দুক, রাইফেল, ডিনামাইট ছিল তা পুলিশ হস্তগত করল। ধৃত বিপ্লবীদের আলিপুর জেলে আনা হ'ল।

বন্দীদের নিয়ে সুরু হ'ল আলিপুর বোমার মামলা। আলিপুর বোমার মামলা সুরু হয় বালির কোর্টে ১৯শে মে। ১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলল এই মামলা। বিপ্লবীরা আত্মভোলা তরুণের দল। সন্ন্যাসীর মত তাই তাঁরা নির্বিকার চিত্তে সাধারণ কয়েদী জীবনের দুঃখকষ্ট হাসিমুখে বরণ করেন। হাসি-তামাসা, খেলা, গান, আমোদ-প্রমোদের মধ্যে তাদের দিন কাটে। জেলের চুয়াল্লিশ ডিগ্রি আর ছ ডিগ্রি হ'ল বিপ্লবীদের স্মৃতি ভরা তীর্থ।

* * *

আলিপুর বোমার মামলায় নরেন গোঁসাই নামক একজন বন্দী রাজসাক্ষী হলেন। নরেনের উপর বন্দীদের সন্দেহ হ'ল। কিশোর বন্দী কৃষ্ণজীবন একদিন তাঁকে লাথি মেরে বসলেন।

নরেনকে কর্তৃপক্ষ ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করলেন। তাঁর নিরাপত্তার জন্য দুজন য়ুরেশিয়ান শরীর-রক্ষক নিযুক্ত হলেন।

মেদিনীপুরের সত্যেন বসু অস্ত্র আইনের এক মামলায় মেদিনীপুর জেলে কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। তাঁকে এই মামলার আসামী করে আলিপুর জেলে আনা হ'ল। তিনি নরেন গোঁসাইকে হত্যা করে বিপ্লবীদলকে বাঁচাবার জন্য এক পরিকল্পনা করলেন।

অসুখের জন্য জেল-হাসপাতালে গেলেন সত্যেন বসু। সেখানে নরেন গোঁসাই এর সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হয়। সত্যেন রাজসাক্ষী হবার ভাণ করলেন। নরেন রোজ সত্যেনের সাথে হাসপাতালে সাক্ষাৎ করেন।

মামলা সেসন কোর্টে যায়। দেবব্রত, যতীন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতির মামলা বার্লির কোর্টে চলছিল তখনও।

১লা সেপ্টেম্বর (১৯০৮)। রাজসাক্ষীর জবানবন্দীর দিন।

নরেন ঐ দিন যে সব কথা বলবেন তাতে আরও লোকের ধরা পড়বার সম্ভাবনা। ঐ দিন নরেন গোঁসাই-কে হত্যা করতে হবে এই হ'ল সত্যেন্দ্রনাথের পণ।

সত্যেনের পরিকল্পনা সার্থক করবার জন্য অসুখের ভাণ করে হাসপাতালে এলেন অন্যতম বন্দী কানাই দত্ত। সঙ্গে তাঁর দুটো রিভলবার।

এই রিভালবার দুটো যে কি করে কারগারে এল তা' এক রহস্য-জনক ব্যাপার। প্রকাশ, বাইরে থেকে কানাই-এর আত্মীয়রা পাকা কাঁঠাল এনেছিলেন জেলে কানাই-এর সাথে দেখা করবার সময়। কাঁঠালের মধ্যে নাকি সুকৌশলে লুকান ছিল এই দুটো রিভালবার।

পয়লা সেপ্টেম্বর (১৯০৮)—সোমবার সকাল।

শ্বেতাঙ্গ দেহরক্ষী হিগিনসের সাথে নরেন গোঁসাই এলেন হাসপাতালে সত্যেনের কাছে। সেদিন আদালতে যা যা এজাহার দিতে হবে তা নরেন গোঁসাই সত্যেনের সাথে পরামর্শ করতে চান।

নরেন ও সত্যেনের মধ্যে চলছে কথাবার্তা।

সহসা সত্যেন কোমরে বাঁধা রিভলবার তুলে গুলি ছোড়েন নরেনের উপর। প্রাণ ভয়ে ছুটে পালায় নরেন গোঁসাই।

সত্যেন ছুটলেন তাঁর পিছু পিছু। কানাই আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনিও নরেন গোঁসাইয়ের পিছু পিছু ধাবিত হন। গুলির পর গুলি ছোড়েন দুজন বিপ্লবী।

নরেন জেলখানার সামনে নর্দমায় পতিত হয়। সেখানে তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়।

পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন সত্যেন ও কানাই।

নরেন গোঁসাইকে হত্যার অপরাধে আলিপুরের সেসন জজ মিঃ এফ, আর, রো-র এজলাসে কানাই ও সত্যেনের বিচার সুরু হ'ল।

বিচারে দুজনারই ফাঁসির হুকুম হ'ল।

বাঙালীর আবেদন ও প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হ'ল।

* * *

কানাইলাল

কানাইলাল! (১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭—১০ই নভেম্বর, ১৯০৮): কংসের কারাগারে যেদিন শিশু শ্রীকৃষ্ণ অত্যাচারী নিধনের জন্য জন্মগ্রহণ করেন সেই পূত জন্মাষ্টমী দিনে ১৮৮৭ সালে ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন কানাইলাল দত্ত। কানাই-এর বাবা বোম্বাই শহরে এক আপিসে কাজ করতেন। কানাই-এর বাল্যজীবন বোম্বাইতে অতিবাহিত হয়।

১৯০৩ সনে কানাই দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এর পর সুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবন। কানাই দত্ত ছিলেন খুব ভাল ছাত্র। আহারে-বিহারে, চাল-চলনে তিনি ছিলেন সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। পরদুঃখকাতরতা ছিল তাঁর অন্যতম গুণ।

চোখে মুখে দীপ্ত ছিল তাঁর অনাসক্ত কর্মীর ভাব। আদর্শ বিপ্লবী

সহকর্মীদের বাঁচাবার আকুল আগ্রহে বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত জবাব দিতে কানাইলাল ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিলেন ১৯০৮ সালের ১০ই নভেম্বর উষায়।

একুশ বছর বয়সের ছেলের সে কি অসীম সাহস। সেই বয়সে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন গীতার মর্ম—আত্মা অবিনশ্বর।

ফাঁসির হুকুম শুনে তাঁর ভয় হয় নি—আনন্দে বৃদ্ধি পেয়েছিল তাঁর দেহের ওজন। ফাঁসিমঞ্চে নিয়ে যাবার একটু আগে দেখা গেল অকাতরে ঘুমোচ্ছেন তিনি। হাসি মুখে তিনি গলায় পরলেন ফাঁসির রজ্জু। এই ত মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের মৃত্যু।

উন্মত্ত জনতা কানাই-এর মৃতদেহ নিয়ে চলল শ্মশানে। গীতা আর ফুলের মালায় ভরে গেল শবাধার। কানাই-এর ভস্ম নিয়ে পড়ে গেল কাড়াকাড়ি। মরণে তিনি জাগালেন সারা দেশ।

* * *

সত্যেন্দ্রনাথ

সত্যেন্দ্রনাথ। (৩০শে জুলাই, ১৮৮২—২১শে নভেম্বর, ১৯০৮) ঃ

১৮৮২ সালের ৩০শে জুলাই রাখী পূর্ণিমা তিথিতে সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম। স্বাদেশিকতার প্রবর্তক রাজনারায়ণ বসুর তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁর স্বাস্থ্য বরাবর খারাপ ছিল কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন কর্মঠ কর্মী।

১৯০৮ সালের ২১শে নভেম্বর ফাঁসির মঞ্চে তিনি স্বদেশমুক্তির কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করলেন।

কানাই-এর শব-মিছিল এ জনসাধারণের উন্মত্ত উদ্দীপনা দেখে সরকার সত্যেনের শব কারাগারে দাহ করবার ব্যবস্থা করলেন। কলকাতার জনসাধারণ তাঁর কুশপুত্তলিকা নিয়ে মিছিল করতে উদ্যোগী হলেন। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে তাও বন্ধ করলেন।

জাতির নীরব বুকে সত্যেনের মর্মান্তিক স্মৃতি জাগ্রত হ'ল।

* * *

ভীরু, কাপুরুষ বাঙালী মরে অনাহারে—রোগে, শোকে, দুঃখে। মরার মত মরতে জানত না। মুক্তি সাধনার মরণ যজ্ঞে সেদিন ১৯০৮ সালে মরার মত মরতে শিখল বাঙালী—প্রফুল্ল, ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন: এক....দুই···তিন···চার।

মরার পালা হ'ল সুরু।

আলিপুর বোমার মামলা। বিপ্লবীদের পক্ষে দাঁড়ালেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস (সি. আর. দাশ)। শ্রীঅরবিন্দ প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। বারীন্দ্রকুমার ও উল্লাসকরের হ'ল ফাঁসির হুকুম। হাইকোর্টের বিচারে ফাঁসির হুকুম রদ হ'ল।

উপেন্দ্রনাথ প্রমুখ দশজনার হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

অন্যান্য বিপ্লবীরা পাঁচ থেকে দশ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

পুরা এক বৎসর চলে বিচার।

বন্দীদের নিয়ে জাহাজ চলল আন্দামানে। স্বদেশ থেকে বহুদূরে নির্জন দ্বীপে পাষাণ প্রাচীরের আড়ালে বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানরা অসীম নির্যাতন ভোগ করেন। জেলের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ইন্দুভূষণ আত্মহত্যা করেন এবং উল্লাসকর উন্মাদ হন।

আলিপুর বোমার মামলার বিচারের প্রতিবাদে এবং স্বদেশপ্রেমিক বীরদের উপর নির্যাতনের জবাবে বাংলার বিপ্লবীদের হাতে গর্জে উঠে অগ্নিনালিকা—দাঁতের বদলে দাঁত। সন্ত্রাস আর প্রতিশোধ।

···পশ্চিমবঙ্গের লাট ফ্রেজার হত্যার চেষ্টা; আলিপুর বোমার মামলার সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসের হত্যা আর পুলিশের ডেপুটি সুপার সামশুল আলম হত্যা।

পশ্চিমবঙ্গের লাট ফ্রেজার হত্যার চেষ্টা (নভেম্বর, ১৯০৮) :

১৯০৮ সনের নভেম্বর মাসের অপরাহ্ণ। কলকাতার ওভারটুন হলের এক জনসভায় সভাপতিত্ব করছেন পশ্চিমবঙ্গের অত্যাচারী লাট ফ্রেজার। বিপ্লবীর গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি রক্ষা পান। বিপ্লবী যতীন রায় ঘটনাস্থলে ধরা পড়লেন। বিচারে তাঁর দশ বৎসর কারাদণ্ড হয়।

আলিপুর বোমার মামলার সরকারী
উকিল হত্যা (১০ই ফ্রেব্রুয়ারী ১৯০৯) :

১৯০৯ সনের ১০ই ফ্রেব্রুয়ারি, বেলা দ্বিপ্রহর। কলকাতার সুবারবন পুলিশ কোর্ট থেকে বার হয়ে আসছেন "আলিপুর বোমার" মামলার সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস। চারু বসু নামক খুলনার একজন তরুণ যুবক সামনে এসে উপস্থিত হ'ন। তাঁর বা-হাতের কব্জিতে রিভলবার বাঁধা,—নুলো ডান হাতে তিনি টিপলেন তাঁর রিভলবারের ঘোড়া।

উকিলবাবুর প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল। বোমার মামলার বিচারের প্রতিশোধ নিয়ে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিলেন নুলো চারু বসু।

পুলিশের ডেপুটি সুপার সামশুল আলম
হত্যা (জানুয়ারি, ১৯১০ ।

১৯১০ সনের জানুয়ারি মাসের বেলা দ্বিপ্রহর। কলকাতার হাইকোর্ট।

পুলিশের ডেপুটি সুপার সামশুল আলম হাইকোর্ট থেকে বার হয়ে সিড়ি দিয়ে নামছেন এমন সময় একজন তরুণ যুবক এসে সামনে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন—আপনার নাম সামশুল আলম ?

উত্তর হ'ল—হুঁ :!

"এই নিন্ আপনার পুরস্কার।"

গর্জে উঠল আগন্তকের হাতের রিভলবার। সিঁড়িতে গড়ায় সামশুল আলমের প্রাণহান দেহ। আলিপুর বোমার মামলার সাক্ষীসাবুদ যোগাড়ের ভার ছিল এঁর উপর। বিপ্লবীদল তার প্রাতশোধ নিলেন।

আততায়ী বিপ্লবীর নাম বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত। বিচারে তাঁর হ'ল ফাঁসি। দেশের মাটির ধুলায় ঝরে পড়ল আর এক ফোঁটা তাজা খুন।

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা (মার্চ ১৯১০-১৯১১)।

বাঘা যতীন

সামশুল হত্যার ষড়যন্ত্রে প্রায় পঞ্চাশজন লোক ধরা পড়লেন।

হাওড়া কোর্টে তাঁদের বিচার চলল ১৯১০ সনের মার্চ থেকে ১৯১১ সনের এপ্রিল পর্যন্ত। এই মামলার নাম "হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা।"

আসামীদের মধ্যে প্রধান বাঘা যতীন। প্রমাণাভাবে তিনি হলেন বেকসুর খালাস। বারীন ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীরা ধরা পড়ার পর বাঘা যতীন হলেন বিপ্লবীদলের কর্ণধার।

তিনি বাংলা সরকারের সেক্রেটারি হুইলার সাহেবের স্টেনোগ্রাফার ছিলেন। তাঁর এ চাকুরি খতম হ'ল। তখন তিনি আত্মগোপন করতঃ বিপ্লব কার্যের নায়কত্ব করেন। বিপ্লব আবার দানা বাঁধে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির সাহায্যে ভারত থেকে ইংরাজ বিতাড়নের যে সুপরিকল্পিত অভ্যুত্থানের ভারতময় ষড়যন্ত্র হয় তারই মহানায়ক বাঘা যতীন।

পরবর্তী অধ্যায় এই কাহিনী :

॥ চার ॥

সারা ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক অস্ত্রযুদ্ধের প্রথম আয়োজন

বৈদেশিক সহায়তায় ভারত-উদ্ধারের প্রথম প্রচেষ্টা

বাংলার বাইরে বাঙালীর দেখাদেখি বিপ্লব সুরু হয়। মদনলাল ধিংরা পলিটিক্যাল এ-ডি-সি কর্ণেল স্যার উইলিয়ম কার্জনকে হত্যা করে ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ দেন।

মাদ্রাজের তিনেভেল্লির ম্যাজিষ্ট্রেট মিং ত্রাসেঁ ও নাসিকের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জ্যাকসন বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হন।

উত্তর ভারতের বিপ্লব-সংগঠনে বাঙালীর নিষ্কাম অবদান ছিল।

রাসবিহারী বসু, শৈলেন ঘোষ, বসন্ত বিশ্বাস, শচীন সান্যাল প্রভৃতি অনেকে ছিলেন এই সংগঠনের নায়ক।

১৯১২ সন। বঙ্গভঙ্গ তখন সবে মাত্র রদ হয়েছে। কলকাতা থেকে দিল্লীতে এসেছে রাজধানী। সমগ্র নগরী আলোকমালায় সুসজ্জিত। বড়লাট হার্ডিঞ্জ হাতীর পিঠে শোভাযাত্রার সাথে রাজধানীতে প্রবেশ করছেন। হার্ডিঞ্জের উপর পড়ল বোমা। বড়-লাটের কোন ক্ষতি হয় না। শুধু একজন আরদালি নিহত হয়।

এই ঘটনার পাঁচ মাস পরে লাহোর লরেনস গার্ডেনে আবার বোমা ফাটে। এবারও একজন আরদালি মারা যায়।

পুলিশ আবিষ্কার করল যে দেরাদুন ফরেষ্ট আপিসের বিশিষ্ট সহকারী রাসবিহারী বসুর এ সব কীর্তি। পুলিশ তাঁকে ধরতে পারল না। ধরা পড়লেন তাঁর সহকর্মী আমীর চাঁদ, অবধবিহারী,

বাল মুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাস। সুরু হ'ল দিল্লী ও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। সকলের হ'ল ফাঁসি।

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকট পোড়াগাছা গ্রামে বসন্তকুমার বিশ্বাসের জন্ম। দিল্লীর কোন এক বাড়ির ছাদ থেকে কিশোরী বালিকার ছদ্মবেশে তিনি হার্ডিঞ্জের উপর বোমা ফেলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে পাঞ্জাবের আম্বালা জেলে তাঁর ফাঁসি হয়।

আর মহানায়ক রাসবিহারী! ইংরাজ-বিরোধী জার্মান শক্তির সাহায্যে ভারতকে মুক্ত করবার জন্য তিনি জাপানে পলাতক হন।

জার্মানীর সাথে ইংরাজের যুদ্ধ বাঁধল। এই সুযোগে বাংলা ও পাঞ্জাবের বিপ্লবীদল ভারতের অভ্যন্তরে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করলেন। আর প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মানের সহিত ষড়যন্ত্র রচনায় ব্রতী হলেন। ব্যাটাভিয়ায় জার্মানীর সহিত বিপ্লবী ভারতের সংযোগকেন্দ্র স্থাপিত হ'ল। ব্যাংককে বিপ্লবীদের প্রতিনিধি গেলেন ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ব্যাটাভিয়ায় সি. মার্টিন এই গুপ্ত নামে চললেন নরেন ভট্টাচার্য। পরবর্তীকালে তিনি এম. এন. রায় নামে বিখ্যাত হন। অবনী মুখার্জি জাপানে রাসবিহারী বসুর সাথে মিলিত হলেন।

নানা সুত্রে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের কথা ইংরাজ শাসকরা জানতে পারে। অবনী মুখার্জি রাসবিহারী বসুর সহিত দেখা করে ভারতে আসার পথে পথিমধ্যে গ্রেফ্‌তার হন। সিঙ্গাপুরে তাঁর ফাঁসি হয় (১৯১৫)। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় গোয়াতে ধরা পড়েন। পুনা জেলে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্মহত্যা করেন।

* * *

বাংলার বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের নায়ক বাঘা যতীনকে খোঁজ করে পুলিশ। বাংলায় তখন বিচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটছিল।

১৯১৩ সন।

মৌলভীবাজারে জেলা ম্যাজিষ্ট্রট গর্ডনকে মারতে গিয়ে একজন অজ্ঞাতনামা বিপ্লবী হাতের উপর বোমা ফাটায় মারা যান। ময়মনসিংহে মারা যান পুলিশের দারোগা বঙ্কিম চৌধুরী। মেদিনীপুর-ষড়যন্ত্র মামলার উৎসাহী কর্মচারী আবদার রহমানকে লক্ষ্য করে বিপ্লবীরা বোমা নিক্ষেপ করে। বোমা না ফাটায় তাঁর প্রাণ রক্ষা পায়।

১৯১৪ সন।

আই, বি'র ডি. এস. পি যতীন্দ্রমোহন ঘোষ একটি ছোট শিশুকে কোলে করে দোর গোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। চার পাঁচজন লোক অকস্মাৎ তাঁকে আক্রমণ করেন। যতীন ঘোষ ইহধাম থেকে বিদায় নেন।

সিরাজদীঘিতে গুপ্তচর ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হন।

আই-বি'র ইনস্পেকটর নৃপেন্দ্র ঘোষ ট্রাম থেকে অবতরণ কালে বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হন।

পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বসন্ত চাটার্জির উপর বোমা পড়ে কিন্তু মারা যায় একজন পুলিশ। কোন ক্ষেত্রেই আততায়ী ধৃত হন না।

১৯১৪ সনের সবচেয়ে রহস্যজনক ঘটনা রডা কোম্পানির পিস্তল চুরি।

২৬শে আগষ্ট, ১৯১৪ সাল। রডা কোম্পানির বন্দুক পিস্তলের দোকান। মাল খালাস করবার জন্য চললেন কোম্পানির শ্রীশচন্দ্র ঘোষ নামক একজন কর্মচারী। ভদ্রলোকটি সমস্ত মাল বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হলেন। এভাবে বিপ্লবীদলের হাতে এল পঞ্চাশটি মশার পিস্তল এবং ৪৬,০০০ হাজার কার্তুজ। বিপ্লব কার্যে এই ভদ্রলোকের অবদান চিরস্মরণীয়।

রডা কোং-এর পিস্তল চুরি এবং ১৯১৫ সালের প্রারম্ভকালে

বেলিয়াঘাটা (১২ই জানুয়ারী) ও গার্ডেনরিচের (২২শে ফেব্রুয়ারি) রোমাঞ্চকর দুটি ডাকাতি সম্বন্ধে পুলিশ বাঘা যতীনের খোঁজ করে।

বাঘা যতীনের সন্ধানে রত পুলিশ ইনস্‌পেকটর সুরেশচন্দ্র মুখার্জি হেতুয়ার মোড়ে চিত্তপ্রিয়ের গুলিতে নিহত হন। ২৬শে ফেব্রুয়ারি—১৯১৫)।

মসজিদ বাড়ি ষ্ট্রীটের একটি বাড়িতে বড় বড় পুলিশ অফিসারদের আলোচনা সভা চলছিল।

সহসা বাঘা যতীনের লোক তাঁদের উপর গুলি চালিয়ে পলাতক হন। একজন অফিসার নিহত হন এবং অনেকে আহত হন।

বাঘা যতীনের পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে নীরদ হালদার নামক এক গুপ্তচর প্রবেশ করে (২৪শে ফেব্রুয়ারি-১৯১৫)। বাঘা যতীন তাঁকে নিহত করে সহকর্মী বিপ্লবীদের সাথে পলাতক হন। সহকর্মী চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, বীরেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিশ্চন্দ্র সহ বাংলাদেশ ত্যাগ করে ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে বাঘা যতীন আশ্রয় নিলেন।

* * *

সামনে সারা ভারতব্যাপী অভ্যুত্থানের নির্দিষ্ট তারিখ। বিপ্লবীরা এক একজন এক একটি কাজের ভার নিয়ে এক এক দিকে অগ্রসর হয়েছেন। যতীন্দ্রনাথ নিলেন বালেশ্বর থেকে মাদ্রাজ রেলপথ অচল করবার ভার।

রায়মঙ্গলের কাছে জুনের মাঝামাঝি (১৯১৫) অস্ত্র বোঝাই জার্মান জাহাজ 'ম্যাভারিক'-এর নোঙ্গর করার কথা। অস্ত্রশস্ত্র নামানর ব্যবস্থা করেছিলেন রায়মঙ্গল থেকে যাদুগোপাল মুখার্জি। সঙ্গীদের সহ যতীন্দ্রনাথ তাঁর সাথে মিলিত হবার জন্য অগ্রসর হলেন। যতীনাথের বালেশ্বরের দিকে রওনা হবার কথা পুলিশ কোন সূত্রে টের পায়।

সারা ভারতময় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের তারিখ নির্দিষ্ট ছিল ২৩শে জুন কিন্তু বিপ্লবী দলের জনৈক সদস্য কর্তার সিং তা ফাঁস করলেন। পুলিশ তৎপর হ'ল।

বাঘা যতীনের সংবাদ পেয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ময়ূরভঞ্জ হয়ে বালেশ্বরের পথে অগ্রসর হন। বিপ্লবীগণ বালেশ্বরের বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। ম্যাভারিক জাহাজ নানান্ গোলযোগে নির্দিষ্ট সময়ে পোঁছাতে পারল না। আশায় আশায় দিন যায়। এদিকে খাবার ফুরিয়ে আসে। খাদ্যের অভাবে গাছের পাতা খেয়ে সমুদ্রের দিকে তাঁরা চেয়ে থাকেন। কখন আসবে "ম্যাভারিক" জাহাজ···কখন তারা হাতে পাবেন জাহাজভরা রিভলবার, ভাঙবেন মায়ের পায়ের বেড়ী।

* * *

সম্মুখে শূন্যদৃষ্টি। পিছনে সশস্ত্র টেগার্ট বাহিনীর পদধ্বনি।

পরাধীন দেশ ও সমাজকে সেবা করবার এই ত' পুরস্কার।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের রক্তাক্ত ৯ই সেপ্টেম্বর।

পঞ্চ বিপ্লবীর সম্মুখে ব্যর্থতা ও মৃত্যুর নির্মম ক্ষণ······

হুকুম প্রতিধ্বনিত হয়ঃ Surrender.

বিপ্লবীদের আস্তানার সন্ধান দিয়েছে গ্রামের এক চৌকিদার।

আবার হুকুমঃ Surrender.

সিপাইরা চালায় রাইফেল। গর্জে উঠে বিপ্লবীদের হাতের রিভলবার। পরিখার অভ্যন্তরে বিপ্লবীদের দেখতে পায় না টেগার্টের সিপাইরা। তাদের লক্ষ্য ব্যর্থ হয়। কিন্তু বিপ্লবীদের লক্ষ্য অব্যর্থ।

দলে দলে সিপাই প্রাণ দিল।

সিপাইরা ছল' করে পশ্চাদপসরণ করে। এ কৌশল ব্যর্থ হয় না। কৌতূহলী বিপ্লবীরা পশ্চাদপসরণকারী সিপাইদের দেখবার জন্য পরিখা থেকে মাথা তোলে। অমনি সিপাইদের সন্ধানী গুলি

এসে লাগে চিত্তপ্রিয়ের গায়। পরিখায় লুটিয়ে পড়ল চিত্তপ্রিয়ের প্রাণহীন দেহ।

চিত্তপ্রিয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে অন্যমনস্ক বাঘা যতীনের দেহে সিপাইদের গুলি লাগে। আহত যতীন্দ্রনাথ। গুলি চালান বিপ্লবীরা। পশ্চাদপসরণ করে টেগার্টের সিপাইরা।

ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, শ্রমে কাতর বিপ্লবীরা। পরিখায় লুটিয়ে পড়লেন আহত বাঘা যতীন। মৃত্যু বুঝি আসন্ন। বিপ্লবীরা উত্তরীয় তুলে সন্ধির প্রার্থনা জানায়।

১০ই সেপ্টেম্বর (১৯১৫) ভোর বেলায় বালেশ্বর হাসপাতালে বাঘা যতীন প্রাণত্যাগ করেন। নীরেন দাসগুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেন ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিলেন। জ্যোতিষ পালের হ'ল কালাপানি,—পরে উন্মাদ অবস্থায় পাগলা গারদে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

মুক্তির দুর্বার কামনায় দেশপ্রেমিক বিপ্লবী পাগলের দল মৃত্যুর মাঝে হয়ত পেলেন শান্তি কিন্তু এ মরার মত মরণে পরাধীন ভারতের কপালে রক্ত তিলক পরিয়ে তাঁরা যে নূতন ইতিহাস রচনা করে গেলেন, তার মূল্য ত' দিতে পারবে না কেউ!

মুক্তি কামনায় সে কি ত্যাগ, সে কি কষ্ট স্বীকার, সে কি পরিশ্রম, সে কি সাধনা, সে কি আত্মদান! স্বাধীনতার শত্রু টেগার্ট সাহেব পর্যন্ত টুপি তুলে এই বীরদের সম্মান দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা সেদিন তাঁদের চিনি নি।

বাঘা যতীন—বিংশ শতাব্দীর প্রতাপের সন্ধান দিল এদেশের চৌকিদার, আর তাঁকে হত্যা করল এ দেশের সিপাই।

স্বাধীন ভারতের বাঙালীরা হেদুয়ার (বর্তমান আজাদ্ হিন্দ বাগ) দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বাঘা যতীনের মর্মর মূর্তি স্থাপন করে সেদিনের সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করল।

॥ পাঁচ ॥

ভারতের বিপ্লববাদে ইংরাজের নারকীয় প্রতিহিংসা জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড

[১৩ই এপ্রিল—১৯১৯]

জাগে গান্ধীজীর গণ আন্দোলন—অহিংস অসহযোগ আন্দোলন

(১৯২১)

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রান্তরে জেগেছিল মৃত্যুর ধ্বনি। এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়।

স্বরাজের নাম করে যা হ'ক খানিকটা শাসনতান্ত্রিক সংস্কার দিয়ে ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষাকে খাঁটো করতে চায় শাসক। শাসনতন্ত্র সংস্কারের মানসে ভারতের সেক্রেটারি অফ্ স্টেট মিঃ মণ্টেগু এলেন ভারতে।

বড়লাট চেমসফোর্ডের সাথে চলল সলা পলামর্শ। এল মণ্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার। আর অন্যদিকে এলেন কিংসবেঞ্চের জজ রাওলাট ভারতের বিপ্লববাদ বন্ধ করার উপায় নির্ধারণ করবার জন্য। তাঁর নির্দেশে তৈরী হ'ল 'রাওলাট' বিল। এই "রাওলাট" বিলে সন্দিগ্ধ লোককে বিনা বিচারে আটক রাখার বিধান ছিল।

তীব্র প্রতিবাদের মধ্যে ভারতীয় রাষ্ট্রপরিষদে ১৯১৯ সনের মার্চ মাসে 'রাওলাট' বিল পাশ হ'ল। বড়লাটের সম্মতি পেয়ে বিল আইনে পরিণত হয়।

গান্ধীজি অবিলম্বে এ আইনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সুরু করলেন। তিনি সত্যাগ্রহ করবার সঙ্কল্প নিলেন।

৬ই এপ্রিল, ১৯১৯। সারা ভারতে ঘোষিত হ'ল হরতাল।

পাঞ্জাবে জাগল দারুণ গণ-বিক্ষোভ। পাঞ্জাবের নেতা ডাঃ কিচলু ও ডাঃ সত্যপালের গ্রেফ্‌তার উপলক্ষ করে জাগল গণ-বিক্ষোভ।

বিক্ষুব্ধ জনতা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বাড়ি পুড়িয়ে দিল। পাঁচজন ইংরাজ প্রাণ হারাল। পাঞ্জাবে চলল শাসকদের নারকীয় অত্যাচার।

১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯। সংক্রান্তির দিন রামনবমীর মেলা। রামনবমী উৎসব উপলক্ষে সাধারণ একটি সভা বসেছে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক মাঠে। সরু গলির পর এই মাঠ। মাঠে একটিমাত্র প্রবেশ পথ।

পাঞ্জাবের সামরিক কর্তা তখন মাইকেল ও ডায়ার। পাঁচজন ইংরাজ হত্যার প্রতিশোধবহ্নি তাঁর বুকের রক্তে নাচছে তখন।

সেই উন্মাদনায় ও ডায়ার রামনবমীর সভাকে রাজনৈতিক সভা মনে করে ভুল করলেন।

পঞ্চাশজন গোরা সৈন্য আর একশজন দেশী সিপাই নিয়ে ছুটলেন জালিয়ানওয়ালাবাগ মাঠে সেনানায়ক ডায়ার।

নিরস্ত্র, নিরপরাধ জনতার উপর গুলি চলল। এক আধটা গুলি নয়—ষোলশ গুলি। এগার শ লোক মরল। হতাহতদের মধ্যে ছিল শিশু, নারী, বৃদ্ধ।

পাঞ্জাবের উপর দিয়ে চলল নির্মম পাশবিক অত্যাচার।

সামরিক আইন জারি হ'ল। শহরে জল-আলো বন্ধ হ'ল। অনেক লোক নির্বাসিত হ'ল। গুলির মুখে বহু লোক নিহত হ'ল। বন্দী লোকদের জোর করে রাজপথের উপর বুকে হাঁটান হ'ল।

খাঁচার মত ছোট ছোট ঘরে বন্দীদের আটক রাখা হয়। সদর রাস্তার উপর বেত্রাঘাত সুরু হ'ল।

কালা আদমির হাতে ইংরাজ হত্যার প্রতিশোধে উন্মত্ত শাসক-দল। সমগ্র পাঞ্জাব যেন অবরুদ্ধ, শব-কবলিত প্রদেশ। সর্বশ্রেণীর ইংরাজরা ডায়ারের এ পন্থা সোল্লাসে সমর্থন করলেন।

শুধু ক'একজন ইংরাজ-পাদরি ও মহামতি এণ্ডরুজ প্রতিবাদ জানালেন। এণ্ডরুজকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করতে দেওয়া হ'ল না।

সাগর পার থেকে, এদেশ থেকে ইংরাজরা ঘাতক ডায়ারকে উৎসাহ দেয়। ছাব্বিশ হাজার পাউণ্ডের একটি তোড়া ডায়ারকে তারা উপহার দিল। তাঁর সম্মানে বসল ভোজসভা। বিলাতের রাষ্ট্রনৈতিক ধুরন্ধররা, সাংবাদিকরা পর্যন্ত ডায়ারের পক্ষে ওকালতি করেন।

ইংরাজজাতির কি দারুণ প্রতিহিংসা, কি দারুণ বর্ণবিদ্বেষ।

মহাত্মা গান্ধী অহিংস পন্থায় মুক্তির লড়াই ঘোষণা করেন।

পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবাদে জাগে আন্দোলন।

অত্যাচারের প্রতিবাদে প্রথমে জাগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ। তিনি সরকারের দেওয়া "স্যার" উপাধি ত্যাগ করে বড় লাটের কাছে পত্র দিলেন। অন্ধকারে আলোর সন্ধান পায় ভারত।

আর একজন লোক সেদিন রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। তিনি স্যার শঙ্করণ নায়ার। তিনি বড়লাট সভার সদস্য পদ ত্যাগ করলেন। অনেক ইংরাজবন্ধু বিশ্বকবির উপর সেদিন বিরূপ হলেন।

শুধু বিখ্যাত লেখক বার্নার্ডশ' তাঁকে সমর্থন করলেন।

গান্ধীজির সাথে সরকারের রফা হ'ল। তিনি আপাততঃ সত্যাগ্রহ বন্ধ রাখতে রাজী হলেন। সরকারও পাঞ্জাবের বুক থেকে সামরিক আইন তুলে নিল। বন্দীদের মুক্তি দিল।

অমৃতসরে মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। ভারতবাসী এখানে প্রতিশ্রুত স্বরাজের বদলে পেয়েছিল জালিয়ান-ওয়ালাবাগে ষোলশ' রাউণ্ড গুলি।

গান্ধীজি আরও কিছুদিন ইংরাজের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করতে ইচ্ছুক হলেন।

১৯২০ সন। কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বসল কংগ্রেসের অধিবেশন। এই অধিবেশনে সরকারের সাথে সকলপ্রকার সংস্রব ত্যাগ করবার ও অসহযোগ আন্দোলন সুরু করবার সঙ্কল্প নেওয়া হ'ল।

বাংলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অন্য কোন আন্দোলন সুরু করবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করেন এবং কাজ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হলেন।

১৯২১ সনে নাগপুর কংগ্রেস থেকে ফিরে এসেই তিনি বাংলায় প্রথম সুরু করলেন অসহযোগ আন্দোলন।

অসহযোগ আন্দোলন ভারতের মধ্যে বাংলায়ই প্রথম সুরু হয়।

চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার।

আলিপুর বোমার মামলায় তিনি বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থন করেন। বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁর সংস্রব ছিল।

একদিন তিনি সমস্ত বিলাস-ব্যাসন ত্যাগ করে দেশের জন্য হলেন সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী। বঞ্চিত, মথিত দেশের নীরব ক্ষোভের তিনি ভাষা দিলেন।

মহাযুদ্ধে ভারত ইংরাজকে অকুণ্ঠ সাহায্য করেছিল। ইংরাজ তার পুরস্কার দিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড।

ভারত চেয়েছিল স্বরাজ। ইংরাজ দিল মন্‌টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার—মাকাল ফল।

অতুলনীয় বঞ্চনায় মথিত দেশের বুক। চিত্তরঞ্জন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন।

স্কুল, কলেজ ছেড়ে দলে দলে বাঙালী ছেলেরা বার হ'ল—নামল দেশের কাজে। বিদেশী দ্রব্য বর্জন করবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হ'ল।

সরকার বে-আইনি ঘোষণা করল স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন। ইংরাজের কারাগারে বন্দী হল বিশ হাজার বাঙালী সন্তান।

১৯২১ সনের ডিসেম্বর মাস।

চিত্তরঞ্জনের পত্নী ও ভগিনী বড় বাজারে খদ্দর বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়লেন।

বাংলায় আরম্ভ হ'ল অসহযোগ আন্দোলন।

সারা ভারতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল।

মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির নেতৃত্বে মুসলমানরাও ঝাঁপিয়ে পড়ল এ আন্দোলনে। দিকে দিকে চলে আন্দোলনের ঢেউ।

জাগ্রত বাংলার নেতা চিত্তরঞ্জনকে ভারত সরকার বন্দী করল। নেতাকে বন্দী করে বাংলাকে খোঁড়া করবার আর উপায় নাই। আন্দোলন চলে।...

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার তখন চালু। যুবরাজ আসছেন বিলাত থেকে এদেশে। সর্বত্র হরতাল হয়। কলকাতার সাহেবদের পেটে সেদিন অন্ন পড়েনি। সেদিন শহরের হোটেল সব বন্ধ ছিল।

১৯২২ সন। পয়লা ফেব্রুয়ারি।

বড়লাট রিডিং-এর নিকট পত্র দিলেন মহাত্মাজী।

—সাতদিনের মধ্যে ভারতের অবহেলিত আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি ইংরাজের মনোভাবের পরিবর্তনের আভাস না পেলে তিনি বারদৌলিতে সুরু করবেন পরিকল্পিত অসহযোগ আন্দোলন। সহসা ঘটল এক ঘটনা।

পাঁচ দিন পর।

চৌরিচৌরা…

কংগ্রেসের এক শোভাযাত্রায় থানার পুলিশ বাধা দেয়।

জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়—আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল থানা। একুশজন কনেষ্টবল সহ একজন দারোগা মারা গেল।

হিংসায় ব্যথিত হলেন অহিংসামন্ত্রের সেবক মহাত্মা গান্ধী। বন্ধ করে দিলেন আন্দোলন।

পরের মাসে আপত্তিকর লেখার জন্য গান্ধীজির জেল হ'ল ছ বছর। এর ক'মাস পর চিত্তরঞ্জন মুক্তি পেলেন।

আন্দোলন তখন স্তব্ধ।

চিত্তরঞ্জন

যুদ্ধ এল,—পৃথিবীর প্রথম মহাযুদ্ধ।

১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত চলল যুদ্ধ। একদিকে ইংরাজ, অন্যদিকে জার্মান। ইংরাজের বিপদ ভারতের স্বাধীনতা লাভেবে পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। ভারতকে অস্ত্র ও অর্থ পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিল জার্মান। ভারতের বুক থেকে বিপ্লবীরা ইংরাজ তাড়াবার আয়োজন করল। এ আয়োজন ব্যর্থ হ'ল।

ইংরাজ অবশেষে যুদ্ধে জয়লাভ করল। ভারতের বিপ্লববাদ ধ্বংস করবার জন্য তারা জারি করল দমন-নীতিমূলক আইন—রাওলাট এ্যাক্ট। প্রতিশ্রুত স্বরাজের বদলে এল নির্যাতন।

পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক স্থানে একটা সভা হচ্ছিল। সভায় ছিল ছেলে মেয়ে বুড়ো জোয়ান। পাঁচিল ঘেরা জায়গায় একটি মাত্র গেট। ইংরাজ সেন্যাধ্যক্ষ ডায়ারের আদেশে সৈন্যরা এসে

দাঁড়াল সেই গেটের মুখে। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চলল। সেদিন গুলিতে এগারশ' ভারতবাসী মরল।

সমগ্র ভারতের চিত্ত হ'ল ক্ষুব্ধ।

ভারতের দমননীতির প্রতিবাদে মহাত্মাজী এসে দাঁড়ালেন জনসাধারণের মাঝখানে। তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন একজন বাঙালী। ইনি দেশের জন্য সর্বস্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

১৮৭০ সালের ৫ই নভেম্বর তারিখে কলকাতায় দেশবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। বহু মহাপুরুষের কীর্তি মণ্ডিত ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনীর একজন সুসন্তান তিনি। তাঁর পিতার নাম ভুবনমোহন দাশ ও মাতার নাম নিস্তারিণী দেবী। এঁরা ব্রাহ্ম ছিলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। তারপর তিনি বিলাতে যান এবং সিভিল সারভিস পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। তখন তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করে দেশে ফিরে আসেন। ১৮৯৩ সাল থেকে তিনি হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করতে সুরু করেন কিন্তু ক' বছর কোন পসারই করতে পারেন না। তাঁর পিতাও এ সময় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আর্থিক দুর্দশা ধীরে ধীরে এমন চরমে উঠে যে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পিতা-পুত্র উভয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়েন।

ভুবনমোহন তখন বার্ধক্যে উপনীত। তিনি আর্থিক দুর্দশার জন্য কয়েক স্থানে ঋণ গ্রহণ করেন। তাঁর এক বন্ধুর ঋণের জন্য তিনি আবার এ সময়ে জামিন হন। এ টাকাও তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ে।

সর্বসাকুল্যে দেনা এরূপ মোটা অঙ্কে গিয়ে দাঁড়ায় যে তাঁকে দেউলিয়া হতে হয়। চিত্তরঞ্জন পিতার সহিত সব দেনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন—ফলে তিনিও দেউলিয়া হন। পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জনের আর্থিক অবস্থার উন্নিত হলে তিনি সমুদয় ঋণ শোধ করে দেন। যদিও সে সব দেনা শোধ করবার তাঁর আর কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না।

এই অসাধারণ সততা ও মহানুভবতা একদিন তাঁর 'দেশবন্ধু' নাম সার্থক করল।

এই আর্থিক দুর্দশার মধ্যে তিনি বিবাহ করেন। দেশবন্ধুর পত্নী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী তাঁর জীবনের সুযোগ্যা সঙ্গিনী। এই সম সময়ে তাঁর কবিতাগ্রন্থ 'মালঞ্চ' ও 'মালা' প্রকাশিত হয়। সাহিত্য তিনি পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন নি। তাঁর সাহিত্য অসাধারণ সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচায়ক নয়, তবুও বাংলা সাহিত্যে তাঁর কবিতার আসন অক্ষয়—কারণ তাঁর কাব্যে ভগবান আর মানবজীবন রূপ পেয়েছে অপরূপ। তাঁর কবিতায় আমরা দেখি স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে—যাঁর জীবন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ব্রাহ্ম ধর্মের গণ্ডী পার হয়ে এসে আশ্রয় নিল বৈষ্ণব-ধর্মের মাঝে। চিত্তরঞ্জনের কবিতা সেই জীবনধারার অভিব্যক্তি।

সাংবাদিকতায়ও চিত্তরঞ্জনের নাম সুপরিচিত। শ্রীঅরবিন্দের 'দৈনিক বন্দেমাতরম' কাগজ-এর সম্পাদকমণ্ডলীতে তিনি ছিলেন। তিনি যখন অসহযোগ আন্দোলনের পর 'স্বরাজ্য পার্টি' স্থাপন করেন তখন তিনি প্রকাশ করেন ইংরাজী কাগজ 'ফরোওয়ার্ড'। তিনি 'ফরোওয়ার্ড' এর সম্পাদক ছিলেন। বাংলা ভাষায় তিনি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'নারায়ণ' প্রকাশ করেন এবং সম্পাদনাও করেন। এই পত্রিকায় 'বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্য' নিয়ে আলোচনা হত। সাহিত্য আন্দোলনেও তিনি জড়িত ছিলেন। ১৯১৫ সালে তিনি বাংলার সাহিত্যসভার সভাপতি নির্বাচিত হন।

কাব্যে, সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় চিত্তরঞ্জনের এত দান কিন্তু ক'জন তাঁর খবর রাখে। তাঁর আইন-ব্যবসায়ের খ্যাতি ও রাজনীতিক সুনাম এত বেশী ছিল যে তাঁর সাহিত্য-কীর্তি সাধারণ লোকের চোখে পড়ে নি।

বঙ্গভঙ্গের বিক্ষোভের মধ্যে বাংলার বিপ্লববাদের জন্ম। সেদিন চিত্তরঞ্জন একজন কবি মাত্র।

আইন ব্যবসায়ে পসার কিছুই হয়নি। বাংলার বিপ্লববাদের প্রধান নেতা সেদিন অরবিন্দ ও বারীন্দ্র দুই ভাই। অরবিন্দ ইংরাজী দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' কাগজ বার করে গরম রাজনীতি প্রচার করছেন। আর বারীন্দ্র তাঁদের মাণিকতলার মুরারীপুকুর বাগান বাড়ীতে বোমার কারখানা খুলে হাতে-কলমে বিপ্লব আনবার চেষ্টা করছেন। তরুণ চিত্তরঞ্জনও সেদিন গরম রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। তিনি 'বন্দেমাতরম্' সম্পাদক মণ্ডলীতে ছিলেন।

মজঃফরপুরে কলকাতার প্রাক্তন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়িতে প্রফুল্ল চাকী আর ক্ষুদিরামের বোমা পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে মুরারী পুকুরের বাগানে তল্লাসী হ'ল। সেদিন ১৯০৮ সালের ২রা মে। দলের প্রয়ে সবাই ধরা পড়ল। বোমা, পিস্তল, কার্তুজ, বারুদ অনেক কিছু সেখানে পাওয়া গেল। ধৃত বন্দীদের নিয়ে সরকার আলিপুর বোমার-মামলা খাড়া করল। এই মামলায় অভিযুক্তদের পক্ষ বিনা পারিশ্রমিকে চিত্তরঞ্জন সমর্থন করেন। সেদিন তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

এই তাঁর আইন ব্যবসায়ের উন্নতির মূল। ১৯২১ সনে অসহযোগ আন্দোলনে তিনি আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। এই-তের বৎসরে আইন ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা যে তিনি উপায় করেছেন তার আর ইয়ত্তা নেই। বাৎসরিক তাঁর আয় ছিল সাত আট লক্ষ টাকা।

তরুণ বয়সে চিত্তরঞ্জন যে গরম রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন তাতে তিনি আজীবন সহায়তা করেছেন। মানিকতলার বোমার মামলার পর বাংলার বিপ্লবীরা হলেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন,—পিছনে গুপ্তচর, দেশের মাটিতে মাথা রাখবার ঠাঁই নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজ-জার্মানের দ্বন্দ্বের অবকাশে তাঁরা জার্মানির সাহায্যে ভারত স্বাধীন করবার প্রচেষ্টা করছেন। সেদিন গোপনে বিপ্লবী দলকে তিনি সাহায্য করেছেন। বাইরে তিনি সেদিন ছিলেন ভোগী, বিলাসী ও অপব্যয়ী

কিন্তু তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবাহিত হ'ত ফল্গুধারার মত প্রচ্ছন্ন দেশপ্রেম।

বাংলার বিপ্লবীরা চিত্তরঞ্জনকে কোনদিন ভোলেন নি। তাই গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে চিত্তরঞ্জন যখন তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন তখন চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে বাংলার বিপ্লবীরাও সে আন্দোলনে নামলেন, যদিও সেদিন বিপ্লবীদের গান্ধীজির অহিংস-নীতির সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার দান হয়েছিল সবচেয়ে প্রবল।

অসহযোগ আন্দোলন। চিত্তরঞ্জন সেদিন প্রকাশ্য ভাবে ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন। সেই ইতিহাসই চিত্তরঞ্জনের শেষ ইতিহাস।

প্রকাশ্য রাজনীতিতে আমরা প্রথম চিত্তরঞ্জনকে দেখি বাংলা কংগ্রেসের অধিবেশনের মঞ্চে সভাপতির আসনে ১৯১৭ সালে। সেদিন তিনি দেন নি আমাদের রাজনীতির আহ্বান। সেদিন তিনি কবির কণ্ঠে শোনালেন আমাদের বাংলার প্রাচীন গৌরব কাহিনী।

পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার গ্লানি বাংলার কৃষ্টিকে কি ভাবে নষ্ট করতে চলেছে তার কথাও শোনালেন তিনি। গ্রাম-সংগঠনে তিনি উদ্বুদ্ধ করলেন বাঙালীকে। তারপর থেকে তাঁকে কর্মঠ দেখতে পাওয়া যায় কংগ্রেস রাজনীতির মধ্যে। কংগ্রেসের নায়িকা তখন এনি বেসান্ত। তাঁর নীতির বিরোধিতা করলেন চিত্তরঞ্জন। তার ফলে এনি বেসান্তের দল 'মডারেট' দল নামে একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেন।

১৯১৮ সনে মডারেট দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জনের পূর্ণ প্রাদেশিক স্বাতন্ত্রের দাবী দিল্লীর কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত হ'য়।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ। প্রতিশ্রুত স্বরাজের বদলে ইংরাজের কাছ থেকে ভারবাসী পেল চরম দমন-মূলক আইন রাওলাট এ্যাক্ট আর

জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ড (১৯১৯)! সেই অত্যাচারের প্রতিবাদে চিত্তরঞ্জনের কণ্ঠ থামেনি কোন দিন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্য কংগ্রেস একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটিতে গান্ধী, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি নেতা ছিলেন। এখানে প্রথম গান্ধীর সাথে চিত্তরঞ্জনের আলাপ হয়। উভয়ে সরাসরি মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন।

এবার সংগ্রাম।

১৯২০ সাল। কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসল। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব তুললেন এবং দেশবন্ধু আইন পরিষদের ভিতর দিয়ে সংগ্রামের প্রস্তাব দিলেন। গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। এল অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ। চিত্তরঞ্জন মতানৈক্য সত্বেও বিশ্বস্ত সৈনিকের মত কংগ্রেসের আদর্শ মেনে নিলেন। তিনি শামলা ছেড়ে খদ্দর ধরলেন। আদালত ছেড়ে বক্তৃতা মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাংলাও তার প্রিয়তম নেতার অনুগামী হ'ল।

১৯২১ সন। স্কুল কলেজ ছেড়ে ছেলেরা বার হয়ে এল। সরকারী কার্যালয় থেকে উকিল, কেরানী, কর্মচারী বার হ'ল। বিদেশী শাসকের নির্যাতন সুরু হ'ল। চিত্তরঞ্জন জেলে গেলেন। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতারা তখন জেলে।

গান্ধীজী বাইরে। এ সময়ে যুক্তপ্রদেশে গোরক্ষপুরের নিকট চৌরিচৌরা গ্রামে একটা কাণ্ড ঘটল। শোভাযাত্রীরা আর অহিংস থাকতে পারল না, তারা চৌরিচৌরা থানায় আগুন ধরিয়ে দিল। আগুনে পুড়ে মারা গেল একুশ জন পুলিশ আর একজন দারোগা। গান্ধীজী ক্ষুব্ধ হ'লেন।

১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বারদৌলিতে কংগ্রেসের সভা বসল।

সেই সভায় গান্ধীজী বন্ধ করে দিলেন চৌরীচৌরা আন্দোলন। কারাগারে বন্দী নেতারা ক্ষুব্ধ হ'লেন। কিন্তু গান্ধীজীর সংকল্প অটল।

পরের মাসে কয়েকটা আপত্তিকর লেখার জন্য গান্ধীজীর ছ'বছর জেল হ'ল। এদিকে ২২শে জুলাই তারিখে চিত্তরঞ্জন মুক্তি পেলেন। কংগ্রেসের তখন কোন আন্দোলন নেই। ঐ সনেই গয়ার কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি রূপে চিত্তরঞ্জন আইন পরিষদের ভিতরে থেকে সংগ্রামের প্রস্তাব দিলেন। এবার সে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল না। পরের বছর কংগ্রেস অধিবেশনে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯২৩ সন। চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে "স্বরাজ্য দল" গঠিত হ'ল। বাংলার আইন-পরিষদে "স্বরাজ্য দল" একক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হ'ল। তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করতে রাজী হলেন না। ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে তাঁর দল মন্ত্রিদের বেতন পাশ করল না এবং মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের শাসন নীতি অকেজো করে দিল।

১৯২৪ সন। 'স্বরাজ্য দল' করপোরেশন অধিকার করল। পর পর দু বছর, তিনি মেয়র নির্বাচিত হলেন। এসময়ে তিনি তারকেশ্বরের মোহান্তের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জয়ী হন। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ তাঁর এক বিরাট কীর্ত্তি।

এই বছরেই হঠাৎ একদিন কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে গোপীনাথ সাহা নামে একজন তরুণ বিপ্লবী স্যার চার্লস টেগার্টকে মারতে গিয়ে মারলেন আর্নেষ্ট ডে-কে। বিচারে গোপীনাথের ফাঁসি হয়। সরকার বিপ্লববাদের গন্ধ পেয়ে অর্ডিনান্স পাশ করে বিপ্লববাদীদের বিনা বিচারে আটক করতে লাগলেন। এই অর্ডিনান্স ১৯২৫ সনে 'বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট' নামে আইনে পরিণত হয়। চিত্তরঞ্জন আইনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ তোলেন। এই আইনের নাম দেন 'বে-আইনী আইন' (Lawless Law).

এই কর্ম জীবনের মাঝে সর্বস্বত্যাগের আহ্বান তাঁর মনকে ক্রমশঃ নাড়া দিচ্ছিল। তাঁর কবি অন্তর, বৈষ্ণব মন তাঁকে নিঃশেষে আত্মদান করবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিল। তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব... মায় বসতবাটি পর্যন্ত মেয়েদের হাসপাতাল আর সেবাব্রত শিক্ষার জন্য দান করে গেলেন। তাঁর সর্বস্ব দিয়ে গড়া "চিত্তরঞ্জন সেবাসদন" তাঁর কীর্তির পূত নিদর্শন। এই আত্মত্যাগের জন্য দেশবাসী তাঁকে 'দেশবন্ধু' আখ্যায় ভূষিত করেন।

এরপর তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য সূত্র প্রকাশ করেন। শ্রমিক আন্দোলনেও তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। দু দুবার তিনি বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। তাঁর স্বরাজ ছিল সাধারণের স্বরাজ। মুষ্টিমেয় দু চারজন বড়লোকের হাতে রাষ্ট্র শক্তি এলেই যে তাকে স্বরাজ বলা চলতে পারে না এই ছিল তাঁর বাণী।

শেষজীবনে চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি একান্তভাবে অনুরাগী হন। কারাগারেই চিত্তরঞ্জনের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। তিনি স্বাস্থ্য লাভের জন্য দার্জিলিং শৈলশিখরে যান। সেখানে ১৯২৫ সনে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু ঘটে।

সেদিন ইনসিন জেলে বন্দী তাঁর প্রিয় শিষ্য তরুণ সুভাষ বাংলা তথা ভারতের ভাবী নেতা। তাঁরই সংগ্রাম ও আত্মদানের মাঝে জাগল মুক্তির সংকল্পে অটল নূতন ভারত। পরবর্তী বাইশ বছরের কর্মচঞ্চল সংগ্রামের শেষে এল মুক্তি। পরাধীনের একান্ত কাম্য মুক্তি।

॥ ছয় ॥

নূতন বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রস্তুতি

অস্ত্রাগার আক্রমণ ও ইংরাজের শক্তিকেন্দ্র অধিকারের পরিকল্পনা ঃ

(১৯২৪—৩০)।

ও

নূতন সংগ্রামী গণ-আন্দোলন

আইন অমান্য আন্দোলন ঃ

(১৯৩০)

অসহযোগ আন্দোলন শেষ হ'ল।

চৌরিচৌরার (৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২২) হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য অহিংসামন্ত্রের সেবক মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন।

বাংলার তরুণ সমাজ ক্ষুব্ধ হ'ল। বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে তারা অগ্রসর হ'ল।

চৌরিচৌরার ঘটনায় ক্ষুব্ধ বিপ্লবীদের ক্ষোভ প্রথম আত্মপ্রকাশ পায় গোপীনাথ সাহার অগ্নিনালিকার মুখে ১৯২৪ সনের ১২ই জানুয়ারী।

কলকাতার অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার টেগার্ট ছিল তাঁর লক্ষ্য কিন্তু নিহত হলেন আর্নেস্ট ডে নামক একজন সাহেব।

১৯২৪ সনের ১লা মার্চ তারিখে ফাঁসির মঞ্চ থেকে শহীদ

গোপীনাথ চৌরিচৌরার পর বিভ্রান্ত ভারতবাসীর কানে শোনালেন ঘুম ভাঙার গান।

এই একক বিপ্লব ছাড়া চৌরিচৌরার পর সুরু হয় সারা ভারতব্যাপী নূতন বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রস্তুতি।

এতে ছিল চট্টগ্রামের বিপ্লবী সূর্য সেন (মাষ্টারদা)-এর কুশলী সংগঠন এবং গোপন নায়কত্ব। এই প্রস্তুতির প্রধান উদ্দোক্তা কলকাতার কর্মী সন্তোষ মিত্র। ইনি ছিলেন শাঁকারিটোলা ও উল্টাডিঙি পোষ্টাফিসের টাকা লুটের নায়ক। তিনি রাজবন্দীরূপে হিজলী জেলে থাকাকালে (১৯৩২) রক্ষী সৈন্যের গুলিতে নিহত হন।

বাংলায় তখন দুটি বিপ্লবী দল—যুগান্তর ও অনুশীলন দল।

সূর্য সেনের দল 'যুগান্তর' দলের অন্তর্ভুক্ত।

এ সময় "যুগান্তর" "অনুশীলন" দল মিলিতভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলনে প্রয়াসী হন।

একযোগে বাংলার দশটি বৃটিশ শক্তির কেন্দ্র অস্ত্রাগার আক্রমণ এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারী অর্থ অধিকার ছিল বিপ্লবীদের পরিকল্পনা।

বলা বাহুল্য সূর্য সেনের কুশলী গোপন ব্যবস্থাপনা থাকায় শুধু চট্টগ্রামের সসীম ক্ষেত্রে "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অধিকার" সফল হয়।

সূর্য সেন চট্টগ্রাম এলাকা ছেড়ে আসামে পদার্পণ করলেন।

আসামের চা বাগানে হ'ল তাঁর গুপ্তবাস।

এই গুপ্তবাসে তাঁর সঙ্গী ছিলেন চট্টগ্রামের রাজেন দাস আর খুলনার রতিকান্ত।

এই সঙ্গীদের সহায়তায় সূর্য সেন আসামের নানাস্থানে কর্মকেন্দ্র স্থাপনা করেন।

এখানে তাঁর ও অন্যান্য বিপ্লবীদের পরিকল্পনা ছিল আসাম ও বাংলার দশটি জেলার অস্ত্রাগার আক্রমণ ও ইংরাজের শক্তিকেন্দ্র অধিকার।

এই কার্যে বহির্বাংলার নেতাদের সাথে সংযোগ স্থাপনার জন্য আসামের চা বাগান ছেড়ে সূর্য সেন কলকাতায় এলেন একদিন।

১৯২৪—২৫ সালের কথা সে। কলকাতায় শোভাবাজারে তখন সূর্য সেনের গুপ্তবাস।

সুরু হয় বাংলা ও বাংলার বাইরে বৈপ্লবিক কর্মপ্রেচেষ্টার জন্য লোক, অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের আয়োজন।

১৯২৫ সনের ৯ই আগষ্ট রাত্রি।

৮নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেন যুক্তপ্রদেশের কাকোরী স্টেশন ছেড়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে, সহসা মাঝপথে গাড়ী থেমে গেল।

রিভলবারধারী একদল তরুণ যুবক গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। রিভলবারের ফাঁকা গুলি চলে অনবরত। আতঙ্কিত হয় যাত্রী আর রেলের কর্মচারীরা।

সোরগোলের মধ্যে যুবকরা মেলভ্যানের টাকার থলি নিয়ে সরে পড়ল অন্ধকারের ভিতর।

স্বদেশী ডাকাতি। ধরপাকড় সুরু হয়।

যুক্তপ্রদেশের তরুণ দেশকর্মীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করল।

ধরা পড়লেন কজন প্রবাসী বাঙালী যুবক। কাশীর একজন বাঙালী যুবক—সুদর্শন, উচ্চশিক্ষিত ও সাহিত্যিক এ ডাকাতির অন্যতম নায়ক ছিলেন। তাঁর নাম রাজেন লাহিড়ী। পুলিশ তাঁকে কাশীর বাড়িতে পায় না। তিনি তখন দক্ষিণেশ্বরের বাগান বাড়িতে একটী বোমা তৈরির কারখানা স্থাপন করতঃ কয়েকজন বিপ্লবী সহ বোমা নির্মাণে ব্যস্ত।

কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ কোন এক সূত্রে এই কারখানার সন্ধান পায়।

১৯২৫ সনের ১০ই নভেম্বর তারিখে পুলিশ এই কারখানা বাড়ি ঘেরাও করে।

প্রবাসী বাঙালী বিপ্লবী শচীন সান্যাল ও যোগেশ চট্টোপাধ্যায়ের

সাথে বাংলার বাইরে বিরাট বিপ্লবায়োজন সুরু করেন এই রাজেন লাহিড়ী।

কলকাতায় শোভাবাজারের গুপ্তবাসে বসে সূর্য সেন এঁদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। শচীন সান্যাল প্রমুখ নেতাদের এখানে যাতায়াত ছিল। পুলিশ এতদিন এই আস্তানার সন্ধান পায়নি।

কাকোরি ট্রেন ডাকাতি এবং দক্ষিণেশ্বর বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হবার পর পুলিশ শোভাবাজারের গুপ্ত আস্তানার সন্ধান পায়।

বস্তুতঃ সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় অর্থের জন্য সংগঠিত হয় কাকোরি ট্রেন ডাকাতি এবং অস্ত্রের জন্য স্থাপিত হয় দক্ষিণেশ্বরে বোমার কারখানা। নীরব কর্মী সূর্য সেন ছিলেন এর অন্যতম নেতা।

দক্ষিণেশ্বর বোমার কারখানার প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী ও রাখাল দে সূর্য সেনের দলের লোক। প্রমোদরঞ্জন সিটি কলেজের ছাত্র। এঁরা দুজন থাকতেন সূর্য সেনের সাথে শোভাবাজারের আস্তানায়।

১৯২৫ সনের শেষাশেষি পুলিশ শোভাবাজারের আস্তানার সন্ধান পায়। তখনও সূর্যোদয় হয়নি। পুলিশ শোভাবাজারের আস্তানায় হানা দিল।

•

শোভাবাজার। দোতলার একখানি ঘর—রুদ্ধ।

ভিতরে বিপ্লবী সঙ্গীসহ সূর্য সেন। শেষ রাত্রি। আসন্ন প্রভাত।

সহসা বাইরে পুলিশের বুটের শব্দ। রুদ্ধ দুয়ারে পুলিশের করাঘাত। সদ্য নিদ্রোত্থিত বিপ্লবীগণ শয্যাত্যাগ করেন।

প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী সূর্য সেনের অন্যতম সঙ্গী। তিনি ক্ষিপ্র-গতিতে সূর্য সেনকে বাথরুমের ভিতর নিয়ে যান।

বাথরুমের জানালা ভেঙ্গে সূর্য সেনকে জলের পাইপের উপর নামিয়ে দিয়ে প্রমোদরঞ্জন ছুটে যান রুদ্ধ দুয়ারের গায়।

নিজের সমস্ত দেহ দিয়ে তিনি দুয়ার আগলে থাকেন।

ইতিমধ্যে সূর্য সেন জলের পাইপ ধরে নেমে কলকাতার জনসমুদ্রে মিশে যান।

প্রমোদরঞ্জন নিজে সমস্ত বিপদ মাথায় নিয়ে নেতা সূর্য সেনকে বিপন্মুক্ত করলেন। বিপ্লবের কাজের জন্য প্রমোদরঞ্জনের এ আত্মত্যাগ অতুলনীয়।

প্রমোদরঞ্জন পুলিশের হাতে বন্দী হন। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার আসামী হিসাবে তাঁকে আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠান হয়। এখানে ছিলেন তখন দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার সকল আসামী। এই সময় এই জেলে এক রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে।

আই-বি পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট রায় বাহাদুর ভূপেন চ্যাটার্জি আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার বন্দীদের সাথে দেখা করতে এসেছেন। প্রমোদরঞ্জন কারাসঙ্গী অনন্তহরি মিত্রের সাথে তাঁকে ঘটনাস্থলে নিহত করেন। হত্যা অপরাধে অনন্তহরি ও প্রমোদরঞ্জনের বিচার হয়। তাঁরা মাথা পেতে নিলেন ফাঁসির আশিস্‌।

বাংলার বাইরে যুক্তপ্রদেশের আদালতে রাজেন লাহিড়ীর বিচার চলল। বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়।

১৯২৭ সনের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে রাজেন লাহিড়ীর রক্ত সিক্ত করল ফাঁসির কাষ্ঠ।...

* * * *

আমাদের শাসনতান্ত্রিক যোগ্যতা বিচার করবার জন্য জনমত পদদলিত করে এল সাইমন কমিশন। সে অপমানের উচিত জবাব দেবার জন্য বিক্ষুব্ধ জনতা কালো পতাকা নিয়ে আওয়াজ তোলে—সাইমন, ফিরে যাও।

বারদৌলি, মেদিনীপুর, বন্দবিলায় কৃষকরা কর বন্ধ করল—

কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে। কলকাতার কংগ্রেসে (১৯২৮) পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উঠে।

* * *

কর্মচঞ্চল বিপ্লবীদল যখন ১৯২৪-২৫ সনের সর্বভারতীয় বিপ্লববাদ রচনায় ব্রতী তখন একদল কর্মী শ্রমিক আন্দোলন সুরু করে। রাশিয়ার সাম্যবাদীদের সাথে এ দলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

১৯২৯ সনের প্রারম্ভে বত্রিশজন ভারতীয় শ্রমিক-নেতা ধৃত হন।

প্রায় পৌনে চার বৎসর ব্যাপী বিচারের পর তাঁরা গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। এ দলে ছিলেন কয়েকজন বাঙালী।

* * *

পাঞ্জাবে সাইমনবিরোধী বিক্ষোভে ছোট পুলিশ সাহেব স্যাণ্ডার্সের লাঠির আঘাতে লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু ঘটায়। পাঞ্জাব নিল তার প্রতিশোধ। বিপ্লবীর অগ্নিনালিকার সামনে স্যাণ্ডার্সকে জীবন দিতে হ'ল। এসেম্বলীতে বোমা পড়ল।

পাঞ্জাবের এই বৈপ্লবিক কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন আমাদের বাংলাদেশের একজন তরুণ—নাম যতীন দাস। লাহোর সেণ্ট্রাল জেলের অনাচারের বিরুদ্ধে এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মর্যাদার দাবীতে বাষট্টি দিন অনশনে কারাগারে এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীর আত্মদান করলেন ১৯২৯ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর। তাঁর এই অভূতপূর্ব আত্মদানে মুগ্ধ দেশবাসী তাঁর প্রতিমূর্তি দক্ষিণ কলকাতায় হাজরাপার্কের পূর্ব প্রবেশ পথের ডান পার্শ্বে স্থাপন করেছেন।

যতীন দাসের আত্মদানে বাঙালীর সুপ্ত অন্তরে এল পূর্ণ-স্বাধীনতার ডাক। পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবীর পথে এল ভারত। আমাদের শাসনতান্ত্রিক যোগ্যতা বিচার করবার জন্য জনমত পদদলিত করে এল সাইমন-কমিশন (ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮)। বিক্ষুব্ধ জনতা কালো

পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রা বার করে আওয়াজ তোলে—সাইমন, ফিরে যাও।

ভারতের সকল দলের নেতাদের সম্মেলনে নেতারা সিদ্ধান্ত করলেন,—তাঁদের মিলিত দাবী অনুযায়ী দিতে হবে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার। এ দাবী রচনা করবার ভার পড়ল এলাহাবাদের বিখ্যাত ধনী ব্যারিষ্টার মতিলাল নেহরুর উপর। মতিলাল নেহরু জহরলালের পিতা। তিনি যে রিপোর্ট পেশ করলেন তার নাম "নেহরু রিপোর্ট"। এই রিপোর্টে দাবী করা হ'ল—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন।

কলকাতায় বসল কংগ্রেসের অধিবেশন (১৯২৮)। সভাপতি মতিলাল নেহরু। নেহরু-রিপোর্টের বিরোধিতা করলেন তরুণদের পক্ষে জহরলাল ও সুভাষচন্দ্র। এঁরা অবিলম্বে পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করেন।

গান্ধীজীর মধ্যস্থতায় প্রবীণ ও তরুণদের মধ্যে মীমাংসা হ'ল। তাঁর প্রস্তাবে স্থির হ'ল ১৯২৯ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ইংরাজ শাসক যদি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন দিতে সম্মত না হন তবে ভারতের একমাত্র দাবী হবে পূর্ণ-স্বাধীনতা।

১৯২৯ সনের ৩১শে ডিসেম্বর আসন্ন।

লাহোর কংগ্রেস। সভাপতি তরুণ জহর। গান্ধীজী তীব্র কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, '৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রির পর পূর্ণ-স্বাধীনতার একতিল কমও আমরা নেব না। স্বাধীনতা আদায় করবার জন্য আমরা আইন-পরিষদ বর্জন করব—আর ইংরাজের আইন করব অমান্য'।

৩১শে ডিসেম্বর পার হ'ল। ইংরাজ নীরব। সেদিন মধ্যরাত্রির পর ভারতের দাবী হ'ল পূর্ণ-স্বাধীনতা। শত মানবের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—মুক্তি চাই।

*　　　　*　　　　*

গান্ধীজীর নির্দেশে ২৬শে জানুয়ারী (১৯৩০) সমস্ত ভারত 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করল। পুলিশের বেড়াজালের মধ্যেও পার্কে পার্কে, ছাদে ছাদে উড়ল তে-রঙা জাতীয় পতাকা। রাজপথে ধ্বনিত হ'ল, "বন্দেমাতরম্"।

মুক্তিকামী ভারতের সহজ, সরল কণ্ঠে ধ্বনিত হল, মুক্তি চাই।

*　　　　*　　　　*

হিমালয়ের পাদভূমি থেকে সমুদ্রের তটরেখা পর্যন্ত স্বাধীনতার কামনা তরঙ্গ তুলল। এই নব জাগরণের ঋষি সন্ন্যাসী গান্ধী। হাঁটু পর্যন্ত কাপড়। গায়ে কোন আবরণ নেই। মুখে প্রশান্ত হাসি, বিমল জ্যোতি।...

আশ্রম থেকে তিনি একদিন একদল সুদক্ষ ভক্তের সাথে বার হলেন আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করবার জন্য।

১৯৩০ সনের ১২ই মার্চ সকাল সাড়ে ছ'টায় সুরু হ'ল গান্ধীজীর সত্য, প্রেম, অহিংসা ও মুক্তির অভিযান। বুদ্ধ ও গৌরাঙ্গের মতন তিনি সত্যের সন্ধান দিলেন।

দাণ্ডীর পথে চলে গন্ধীজীর অভিযান। মরা দেশের গ্রাম-গ্রামান্তরে জাগে কর্মচঞ্চলতা।

৫ই এপ্রিল মহাত্মাজীর দল পৌছাল দাণ্ডিতে। পরদিন সকাল থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত সারা ভারতে পালিত হ'ল সেবার 'জাতীয় সপ্তাহ'। জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি অমর রাখবার জন্য এই 'জাতীয় সপ্তাহ' পালন করা হয়। এই জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিবস ৬ই এপ্রিল। এদিন সকাল সাড়ে আটটায় মহাত্মাজী দাণ্ডীর সমুদ্রোপকূলে লবণ-আইন অমান্য করলেন। হাজার হাজার লোক এ দৃশ্য দেখল। লক্ষ লক্ষ ঘরে, কোটি কোটি প্রাণে গিয়ে পৌছাল নূতন বাণী: মুক্তি চাই।

ভারতের তিনকূলে লোনা জলে অজস্র লবণ অথচ ইংরাজের

আইনের বিধানে ভারতবাসীদের পয়সা দিয়ে কিনে খেতে হয় সাত সমুদ্র তেরনদী পারের লিভারপুলের লবণ। অহিংস, সত্যাগ্রহীর দল বালুচরে জ্বাল দেয় লোনা জল,—শাসকের তা সহ্য হয় না। সুরু হয় নিপীড়ন। অত্যাচারের আগুনে শত শত দধিচীর হাঁড় পুড়ে ছাই হয়। তার অন্তরালে জাগে নূতন ভারত।

সুরু হল লবণ আইন অমান্য আন্দোলন। একে একে অন্যান্য আইনের উপর হাত পড়ে। বিদেশী বস্ত্র বর্জন, মদের দোকানে পিকেটিং সুরু হয়। কর বন্ধ আন্দোলনও সুরু হয় এক এক জায়গায়। নেতারা বন্দী হলেন। ভারতের কারাগার বন্দীতে ভরে গেল। বাংলা···বিহার···বোম্বাই।

বাংলার নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আর সুভাষচন্দ্র বসু বাংলায় দুজনার নেতৃত্বে দুটি পৃথক সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। বিপ্লবীদল 'অনুশীলন' সমিতি যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্ব গ্রহণ করল। আর 'যুগান্তর' দল নিল সুভাষচন্দ্রের নায়কত্ব। বাংলার তরুণরা দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক হ'ল। দলে দলে চলল সমুদ্রতীরে—কাঁথি, নীলা, মহিষাদল, ডায়মণ্ডহারবারে লবণ তৈয়ারী কেন্দ্রে।

অনতি দূরেই সশস্ত্র পুলিশের শিবির। বাংলার নির্ভীক তরুণরা বালুতীরে জ্বাল দেয় লবণ। ছুটে আসে শান্তিরক্ষক পুলিশ—গর্জে ওঠে আগ্নেয়াস্ত্র। কত তরুণ প্রাণ ঝরে পড়ে বালুচরে। মেয়েরা অকথ্য নির্যাতন সহ্য করল পুলিশের হাতে।

বাংলার ছাত্রদল ছাড়ল স্কুল কলেজ। রাজপথে তারা সুরু করে বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব। তাদের হাতে চুরমার হয় মদের বোতল। আইনের পর আইন ভাঙে বাংলা।

যশোহরের নেতা বিজয় রায়ের নেতৃত্বে ও মেদিনীপুরের নেতা বীরেন শাসমলের নেতৃত্বে বন্দবিলা আর কাঁথিতে কর বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ হয়। বাংলা সেদিন ইংরেজের শাসন ধূলোয় লুটিয়ে দিল

বাঙালী গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমে সত্যাগ্রহের শিক্ষালাভ করেনি। গান্ধীজীর প্রাণসম 'অহিংসা' মন্ত্রের চেয়ে 'হিংসা' মন্ত্রের ভক্ত ছিল বাঙালী। তবুও এই বাংলার মাটিতে গান্ধীজীর প্রবর্তিত আইন-অমান্য আন্দোলন সার্থকতা লাভ করল। এই বাংলায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের জন্য ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম তরুণ প্রাণ বলি হল। সত্যাগ্রহে ভারতের প্রথম শহীদ বাংলার আশু দলুই।

১৯৩০ সনের ২৪শে এপ্রিল নীলায় (চব্বিশ পরগণায়) লবণ আইন অমান্য করতে গিয়ে আশু দলই পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

বাংলার মেয়ে পৃথিবীখ্যাতা কবি সরোজিনী নাইডু ইংরাজের কারাগারের ভয় দূর করলেন কাব্যে আর সঙ্গীতে।

বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন চলেছে একটানা। বিপ্লববাদের মন্ত্রে বাংলা উন্মুখ। সত্যাগ্রহের শিক্ষা—নিঃশেষে আত্মদান, অকুণ্ঠিত কষ্টস্বীকার আর অটুট দেশপ্রেম। বাংলা সত্যাগ্রহের সব শিক্ষাই গ্রহণ করল। তাই বাংলার ঘরে ঘরে এল শাসকের অত্যাচারে সবরমতী সেদিন।

পাঁচ মাস আন্দোলন চলল। বিখ্যাত রাজনৈতিক সাপ্রু ও জয়াকর কংগ্রেসের সাথে শাসকের একটা মিটমাট করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সরকার কংগ্রেসকে আইন অমান্য আন্দোলন রদ করার জন্য অনুরোধ জানাল। কংগ্রেস রাজী হল না।

বিলাতে ১২ই নভেম্বর (১৯৩০) গোলটেবিল বৈঠক বসল। এ বৈঠকের উপর ভারতের কোন আস্থা ছিল না। তারা সেদিন হরতাল পালন করল। বৈঠকেও বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত হল না।

সাপ্রুর অনুরোধে সরকার ১৯৩১ সনের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে নেতাদের মুক্তি দিলেন।

মার্চ মাসের পাঁচ তারিখে মহাত্মা গান্ধী ও বড়লাট আরউইনের সাথে চুক্তি হয়।

আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ হল।

গান্ধীজী চললেন বিলাতে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে। তখন ও অত্যাচার চলছে বাংলা ও সীমান্তে।

অত্যাচারিত বাংলা হল বিক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট।

বাংলার নেতা সুভাষচন্দ্র তখন কারাগারে। বাংলার কারাগারে বাংলার তরুণ কর্মীদল।

বাংলার বুকের উপর দিয়ে চলেছে আইন আর লাঠির অত্যাচার।

গোল টেবিল বৈঠকের ছলনায় বিভ্রান্ত ভারত। আপোষের পথে গান্ধীজী।

একা বাংলা সেদিন স্কন্ধে নিল ত্রিবর্ণ-লাঞ্ছিত পতাকা।

সে পতাকা ভারতের স্বাধীনতার পতাকা।

॥ সাত ॥

শ্রান্তিহীন বাংলার বিপ্লববাদ

—অনির্বাণ ভারতের মুক্তি-কামনার দীপশিখা। [১৯৩০—১৯৩৭]

১৯৩০ সাল।

১৮ই এপ্রিল। আয়ারের স্মরণীয় ইষ্টার দিবস। রাত্রি পৌণে দশটা।

কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের অন্তরালে চট্টগ্রামে বিপ্লবী সূর্য সেনের নায়কত্বে সুরু হয় চট্টগ্রামে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান।

নিজাম পল্টনস্থ সরকারী অস্ত্রাগার ও রিজার্ভ পুলিশ লাইন আক্রমণের ভার ছিল অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষের উপর। উচ্চতর সামরিক কর্মচারীর পোষাকে গণেশ ঘোষ নিজ বাসা থেকে মোটরে বার হলেন।

মোটরের চালক অনন্ত সিংহ। সঙ্গে চললেন হিমাংশু সেন, হরিপদ মহাজন আর বিনোদ দত্ত।

পাহাড়তলী রেলওয়ে অক্সিলিয়ারি বাহিনীর অস্ত্রাগার আক্রমণের ভার ছিল লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের উপর। লোকনাথ বলের বাসা থেকে মোটরে বার হলেন তাঁরা। মোটরের চালক জীবন ঘোষাল। সঙ্গে চললেন রজত সেন, ফণী নন্দী, সুবোধ চৌধুরী।

টেলিগ্রাম ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আপিস আক্রমণের ভার ছিল অম্বিকা চক্রবর্তীর উপর। তিনি কংগ্রেস আপিস থেকে মোটরে বার হলেন ঠিক একই সময়।

মোটরের চালক আনন্দ গুপ্ত।

রেলপথ বিকল করবার ভার ছিল উপেন ভট্টাচার্যের উপর। তিনি ঠিক ঐ সময় স্বকার্য সাধনের জন্য যাত্রা করেন।

আরও ত্রিশজন বিপ্লবী এ সময়ে বার হলেন। তাঁদের কাজ সাক্ষাতের অপেক্ষায় সরকারী অস্ত্রাগারের কাছে অবস্থান।

সর্বশেষে এ সময় রক্ষীদল সহ মোটরে সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন বার হলেন। সঙ্গে সরোজ গুহ, মহেন্দ্র চৌধুরী ও বিধু ভট্টাচার্য। তাঁরা চললেন সরকারী অস্ত্রাগারের দিকে।

* * *

রাজপথ—উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। পাশাপাশি ছোট ছোট তুটো পাহাড়। একটার উপর পুলিশ ব্যারাক, অপরটির উপর সরকারী অস্ত্রাগার। এখানে এসে মিলিত হলেন সঙ্গীদল সহ গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং। আর রক্ষীদল সহ সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন।

অরক্ষিত সরকারী অস্ত্রাগার বিপ্লবীদের অতর্কিত আক্রমণে অধিকৃত হ'ল। ইহা এখন সর্বাধিনায়কের হেডকোয়ার্টার। সর্বত্র বিপ্লবীদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। উপেন ভট্টাচার্য রেলপথ বিকল করলেন এবং অম্বিকা চক্রবর্তী টেলিফোন-টেলিগ্রাম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে হেডকোয়ার্টারে উপনীত হলেন।

পাহাড়তলী রেলওয়ে অক্সিলিয়ারি বাহিনীর অস্ত্রাগার অধিকার করলেন লোকনাথ বল ও নির্মল সেন।

রজত সেনের গুলিতে ইংরাজ অফিসার সার্জেন্ট ফেরেল নিহত হয় এবং প্রহরীরা ও ইংরাজ অফিসাররা পলায়ন করেন। ইংরাজ অফিসাররা সপরিবারে কর্ণফুলির জলে ষ্টীমারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিপ্লবীরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সহ সদল বলে সর্বাধিনায়কের হেডকোয়ার্টার সরকারী অস্ত্রাগারে উপনীত হলেন। সরকারী অস্ত্রাগারে তখন ইউনিয়ন জ্যাকের স্থানে উড়ছে ত্রিবর্ণ-জাতীয় পতাকা।

আগুনে জ্বলে সরকারী অস্ত্রাগার। শূন্যে উঠেছে আগুনের লাল শিখা। ধোঁয়ার কুণ্ডলী—এত আগুন তবু যেন কত অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসেন হিমাংশু সেন। ম্যাগাজিনে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিতে গিয়ে তাঁর গায় লেগেছে আগুন।

হিমাংশু সেন দাঁড়াতে পারেন না। মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যান। অনন্ত সিং ছুটে এসে হিমাংশুকে কোলে করে মোটরে তুলে নিলেন। গণেশ ঘোষ আর জীবন ওরফে মাখম ঘোষাল মোটরে উঠলেন।

শহরের দিকে ছুটল মোটর।

নির্বাক নিস্তব্ধ সূর্য সেন। অনন্ত সিং প্রমুখ বিপ্লবীদের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় তিনি কাটালেন দুঘণ্টা কিন্তু ফিরলেন না তাঁরা। যোগ্য কর্মীর অবর্তমানে নূতন প্রোগ্রামে হাত দেওয়া অসম্ভব। আত্মগোপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন সূর্য সেন। অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিপ্লবীদল উঠলেন জালালাবাদ পাহাড়ে।

* * *

২২শে এপ্রিল। বিপ্লবীদল জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন। অনাহারে, পিপাসায় বিপ্লবীদের দিন কাটে।

আসন্ন সন্ধ্যা। পাহাড় ঘেরাও করে বৃটিশ ফৌজ—একদিকে ইষ্টার্ণ রাইফেল বাহিনী, অন্যদিকে সুর্মাভ্যালি বাহিনী।

দুঘণ্টা ব্যাপী যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যরা পরাজিত হয়। ইংরাজদের আড়াই শ' সৈন্য মারা যায় আর বিপ্লবীদের মৃত্যুর সংখ্যা বার।......

পাষাণ শয়ানে শায়িত বীর দ্বাদশ সন্তান—
লালা নির্মল, মতি কানুন গো, দত্ত মধুসূদন,
নরেন রায়, বিধু ভট্টাচার্য, দাসগুপ্ত জিতেন,
অর্ধেন্দু দস্তিদার, প্রভাস বল, ঘোষ পুলিন,
দত্ত শশাঙ্ক, হরি বল আর ত্রিপুরা সেন।
পাষাণে শয়ান বীর চির নিদ্রায় লীন।
একটি পাহাড় জালালাবাদ
—দুর্গম পথহীন।"

[উদ্ধৃতি : বিপ্লবী সূর্য সেন (মাস্টারদা)—বিশ্ব বিশ্বাস।]

শহরে তিন দিন পরে হিমাংশুর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, জীবন (মাখম) ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত চট্টগ্রাম ত্যাগ করে কলকাতায় চলে যান। ফেণী স্টেশনে তাঁদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। পুলিশকে সংগ্রামে পরাজিত করে তাঁরা কলকাতায় পৌঁছাতে সক্ষম হন।

* * *

কোয়েপাড়ায় বিনয় সেনের গৃহে পলাতক জীবন যাপন করছেন সূর্য সেন। এখানে নির্মল সেন, লোকনাথ বল প্রভৃতি বিপ্লবী মিলিত হয়েছেন। তাঁদের সহযোগে সূর্য সেন তখন চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের পরবর্তী পরিকল্পনা স্থির করছেন। ফিরিঙ্গী বাজারের গৃহত্যাগী বিপ্লবী রজত সেনের নেতৃত্বে একদল তরুণের উপর এই সময় ইউরোপীয়ান ক্লাব অভিযানের নির্দেশ আসে।

৫ই মে, ১৯৩০ সন। রজত সেনের নেতৃত্বে একদল কিশোর

চললেন ইংরাজ নিধনে ইউরোপীয়ান ক্লাবের অভিমুখে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যে অসুবিধা হওয়ায় তাঁরা প্রত্যাবর্তন করেন। ফেরবার পথে বন্ধুদের সাথে নিয়ে বাড়িতে একবার মার সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। খেতে বসেছেন সকলে এমন সময়ে গ্রামের লোকের খবরে পুলিশ এসে পড়ল। তাঁরা পালালেন শ্যাম্পানে নদী পথে।

স্টীমবোটে পুলিশ অনুসরণ করে। শ্যাম্পান থেকে বিপ্লবীরা তীরে নেমে পড়েন কালারপোলের কাছে শণ বনে। একজন মুসলমান ছেলে পুলিশে খবর দেয়। ডি. আই. জি ফার্মারের নেতৃত্বাধীন একদল সশস্ত্র সৈন্যের সাথে কিশোর বিপ্লবীদের যুদ্ধ হয় পরদিন ৬ই মে, ১৯৩০। সম্মুখ সমরে প্রাণ দেন রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, স্বদেশ রায়। জালালাবাদের মত কালার পোলের এ যুদ্ধ অমর।

* * *

অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত কলকাতায় পৌঁচেছেন তখন। কলকাতার যুগান্তর দলের ব্যবস্থাপনায় তাঁরা আশ্রয় পেয়েছেন চন্দন-নগরে গোঁদলপাড়ায় শশধর চক্রবর্তী নামক একজন বিপ্লবীর (খুলনার লোক) ঘরে। সুহাসিনী নাম্নী এক বিপ্লবিনী মহিলা শশধরের স্ত্রী সেজে ঘরকন্না করতেন।

সূর্য সেনের নির্দেশে লোকনাথ বল কলকাতার বিপ্লবীদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য কলকাতায় যাত্রা করলেন এবং গোঁদলপাড়ার গুপ্ত আস্তানায় চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সাথে মিলিত হলেন।

এদিকে জালালাবাদ যুদ্ধে আহত জ্ঞানহীন অম্বিকা চক্রবর্তী জ্ঞানলাভের পর পাহাড় থেকে অবতরণ করেন এবং ফতেয়াবাদ গ্রামে গুপ্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন।

২৮শে জুন, ১৯৩০।

হঠাৎ একদিন ঘটল এক চমকপ্রদ ঘটনা। গোঁদলপাড়ার গুপ্ত

আশ্রয় থেকে অনন্ত সিংহ এলেন লর্ড সিংহ রোডে—করলেন আত্মসমর্পণ। বললেন—চট্টগ্রামের অত্যাচারিত নরনারীর নিপীড়ন লাঘবের জন্য তাঁর এই আত্মসমর্পণ।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ সন।

পুলিশের গুপ্তচরেরা কোন এক সূত্রে চন্দননগরের গুপ্ত আস্তানার সন্ধান পায়।

রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারে টেগার্টের সৈন্যদল এ বাড়ি ঘেরাও করল। বিপ্লবীরা তখন সুপ্ত। জেগে উঠতেই তাঁরা দেখলেন বাইরে পুলিশ। তাঁরা জানালা ভেঙে পাশের পুকুরে ঝাঁপ দিলেন। শব্দ শুনে পুলিশ গুলি চালায়। জীবন ঘোষাল ওরফে মাখম নিহত হলেন। গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্ত ধৃত হলেন।

৯ই অক্টোবর, ১৯৩০।

চট্টগ্রামের এক গ্রাম থেকে অসুস্থ অবস্থায় ধরা পড়লেন অম্বিকা চক্রবর্তী।

এমনি করে চট্টল বিপ্লবের নায়করা একে একে বন্দী হয়ে এলেন বৃটিশের কারাগারে।

* * *

শ্রীপুর গ্রাম। কুন্দপ্রভা সেনের আশ্রয়ে সেদিন সূর্য সেন বাংলার পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল ক্রেক হত্যার পরিকল্পনা করছেন। এর জন্য রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তী নির্বাচিত হন।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস চট্টগ্রাম কলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র। তিনি শুধু মেধাবী ছাত্র নন—চরিত্রবান তরুণ। তাঁর মুখাবয়বে ছিল আদর্শ নিষ্ঠা ও সাধনার ছাপ।

চট্টগ্রামে বিপ্লবান্দোলনের প্রস্তুতির সময় বোমা প্রস্তুত কালে তিনি আহত হন।

অস্ত্রাগার অধিকারে তাই তিনি যোগদান করতে অসমর্থ হন। ক্রেক হত্যায় তিনি যাত্রা করলেন।

১৯৩৩ সন। ১লা ডিসেম্বর—শেষ রাত।

রামকৃষ্ণ ও কালীপদ চাঁদপুর স্টেশন প্লাটফর্মে উপনীত হন। প্লাটফর্মে তখন চাঁটগাঁ মেল। মেলের প্রথম শ্রেণীর কামরায় সাহেবী পোষাকে বসে ছিলেন রেলপুলিশের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী —নাম তারিণী মুখার্জি।

ক্রেক ভ্রমে বিপ্লবীদ্বয় এঁকেই হত্যা করলেন। পুলিশের হাতে রামকৃষ্ণ ও কালীপদ ধৃত হন।

বিচারে অল্পবয়স্ক কালীপদের হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর আর রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের হ'ল ফাঁসির হুকুম। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে তাঁর ফাঁসি হয়।

১৯৩১ সনের মাঝামাঝি।

সূর্য সেন তখন কানুনগোপাড়ার গোপন আস্তানায় বসবাস করছেন।

বরমাগ্রামের দারোগাকে হত্যা করার পর বিপ্লবী তারকেশ্বর কানুনগোপাড়ার আশ্রয়কেন্দ্রে সূর্য সেনের সাথে যোগাযোগ করেন।

চট্টগ্রামের কারাগারের বিদ্রোহী বন্দীদের পলায়নের জন্য সূর্য সেন তখন পরিকল্পনায় রত। তারই রূপদানের ভার পড়ে তারকেশ্বর দস্তিদারের উপর।

এ পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সূর্য সেনের খোঁজ খবরের জন্য চলছে চট্টগ্রামের জনসাধারণের উপর তখন অকথ্য অত্যাচার।

এ অত্যাচারের নায়ক চট্টগ্রামের গোয়েন্দা পুলিশ ইন্সপেক্টর খান বাহাদুর আসানুল্লা।

আসানুল্লা হত্যার জন্য সূর্য সেন নবদীক্ষিত বিপ্লবী চৌদ্দ বৎসরের কিশোর বালক হরিপদ ভট্টাচার্যকে নির্বাচন করলেন।

১৯৩১ সাল—৩০শে অক্টোবর।

নিজাম পল্টন খেলার মাঠে গোয়েন্দা পুলিশের কর্তা আসানুল্লা হরিপদ ভট্টাচার্যের হাতের রিভলবারের গুলিতে নিহত হন।

আসানুল্লার হত্যার প্রতিশোধ নিল পুলিশ। মুসলমান গুণ্ডা ছেড়ে দেয় তারা শহরের হিন্দু অধিবাসীদের উপর। হিন্দুর যথাসর্বস্ব লুট হয়। নারীর উপরও অমানুষিক অত্যাচার হয়।

বালক হরিপদর উপর চলে নির্মম নির্যাতন। বালক হরিপদ নির্বিকার।

বিচারকের অবশ্য দয়া হ'ল। হরিপদ নাবালক—তাই তাঁর মৃত্যুদণ্ড হল না—হ'ল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের নির্দেশে শৈলেশ্বর রায়ের হাতে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট এলিসন প্রাণ দিলেন এবং সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিকের হাতে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্ণো আহত হন।

১৩ই জুন, ১৯৩২।

ধলঘাটে সাবিত্রী দেবীর গৃহে সূর্য সেনের তখন গুপ্তবাস।

সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কল্পনা দত্ত (ভুলু) ও প্রীতিলতা ওয়াদেদার (রাণী) এসেছেন সূর্য সেনের সাথে সাক্ষাৎ করবার জন্য। সহসা রাত্রি দশটায় ক্যাপ্টেন ক্যামেরণের নেতৃত্বে একদল সৈন্য বাড়ি ঘেরাও করল।

বিপ্লবীদের সাথে ক্যামেরণের সৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ হয়।

কল্পনা ও প্রীতিলতা সহ সূর্য সেন পালাতে সক্ষম হন কিন্তু নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন নিহত হন। অপর পক্ষে নিহত হন ক্যামেরণ।

১৯৩২ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে সূর্য সেনের নির্দেশে

পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাবে যে রক্তাক্ত কাহিনীর সৃষ্টি হয় তার অধিনায়িকা ছিলেন প্রীতিলতা।

ঐদিন মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে, কালী দে, শান্তি চক্রবর্তী, প্রফুল্ল দাস সহ প্রীতিলতা রাত্রি দশটায় সাহেব-মেমদের সান্ধ্য মিলনের আড্ডা পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাব আক্রমণ করেন।

পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাবই তখন পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব। পাহাড়তলী রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এই ক্লাব। এই ক্লাবের বহু সাহেব ও মেম এই শনিবারের সান্ধ্য-মজলিসে বিপ্লবীদের আক্রমণে আহত ও নিহত হন কিন্তু প্রীতিলতা পটাসিয়াম সাইনেড গ্রহণ করতঃ আত্মহত্যা করেন।

সূর্য সেন তখন কাট্টলীর আস্তানায়। জৈষ্ঠ্যপুরা গ্রামের 'কুটীর আশ্রয়" ছেড়ে তিনি কাট্টলীর আস্তানায় তখন।

এখান থেকে তিনি পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্য নির্দেশ দেন।

ব্যাপক ইউরোপীয়ান হত্যার আর এক প্রচেষ্টা হয় ১৯৩৩ সনের ৭ই জানুয়ারী।

সাহেবদের ক্রিকেট মাঠ. 'পল্টন মাঠ'-এ হয় এ প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসতি হয়।

নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য ও হিমাংশু ভট্টাচার্য ঘটনাস্থলে মারা যান আর কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন চক্রবর্তী পরে ফাঁসির কাষ্ঠে প্রাণ দেন।

* * *

ধলঘাট থেকে তিন মাইল দূরে গৈরলা গ্রাম।

গৈরলা গ্রামের বিশ্বাস বাটিতে সূর্য সেন তখন পলাতক জীবন যাপন করছেন।

বিশ্বাসবাটির সংলগ্ন সেনেদের বাড়ি। বড় ভাই নেত্র সেন—পানাসক্ত, চরিত্রহীন। সে-ই থানায় খবর দিল।

১৯৩৩-এর ২রা ফেব্রুয়ারি, রাত্রি দশটা। গভীর অন্ধকার।

সূর্য সেনের সাথী সেদিন সুশীল দাসগুপ্ত আর কল্পনা। বাড়ির তিনদিকে সৈন্য। একদিক খালি। সেদিকে বেড়া। তার ওপর ঝোপের ভিতর বিশ্রী ময়লা গড়।

সুশীল দাসগুপ্ত কল্পনাকে কোলে করে বেড়া পার করলেন। কিন্তু অন্ধকারে ময়লার গড়ের জলে পড়লেন কল্পনা। গড়ে উঠল জলের শব্দ। সেই শব্দ লক্ষ্য করে একজন সৈন্য গুলি ছুড়ল। গুলি লাগল সুশীল দাসগুপ্তের হাতে। তাঁর দুই হাতের উপর তখন সূর্য সেনের দেহ। সুশীলের হাত থেকে সূর্য সেন পড়ে যান মাটির উপর।

সূর্য সেন বেড়া পার হলেন। গড়ের দিক নিরাপদ কিন্তু সেদিক লক্ষ্য করে সৈন্যরা ছুড়ছে গুলি। তখন সূর্য সেন গাছের গোড়া ধরে বেড়িয়ে যেতেই এক গুর্খা সৈন্যের হাতে পড়লেন—তিনি বন্দী হলেন।

তখন মধ্যরাত্রি—২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩।

কারাগারের ফটক খুলল শৃঙ্খলিত চট্টল সিংহ সূর্য সেনের সামনে।

কারাগারের বাইরে তখন কল্পনা ও তারকেশ্বর দস্তিদার (ফুটুদা)।

তাঁদের উদ্যোগে সূর্য সেনকে মুক্ত করবার দু-দুটো পরিকল্পনা হয় কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ কর্মীরা সকলেই অপরিণত বয়স্ক, অনভিজ্ঞ, নবদীক্ষিত কিশোর বিপ্লবী।

তিনমাস পর গহিরা গ্রামে কল্পনা ও তারকেশ্বর ধৃত হন।

আশ্রয়দাতা পূর্ণ তালুকদার ও নিশি তালুকদার গুলির আঘাতে নিহত হলেন।

বিচারে সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের হ'ল ফাঁসির হুকুম। কল্পনার হ'ল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। রাত্রিবেলায় সাধারণত ফাঁসি হয় না। সূর্য সেনের বেলায় তার ব্যতিক্রম হ'ল। মধ্যরাত্রির অন্ধকারে

সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের ফাঁসি—১৯৩৪ সনের ১২ই জানুয়ারী। কাল—মধ্যরাত্রি, ১২টা ৪০ মিনিট।

চট্টল বিপ্লবের উপর নামল কাল যবনিকা। তারই অন্তরালে ২রা জুন, ১৯৩৪-এ সহসা একদিন বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনের প্রাণহীন দেহ নবদীক্ষিত এক কিশোর বিপ্লবীর উদ্যত অগ্নি-নালিকার গুলিতে লুটিয়ে পড়ল মাটির উপরে।

*　　　*　　　*

কর্ণফুলীর তীরে রাঙামাটির বুকে সেদিন জেগেছিল এমনি এক আগুন। সে আগুনে কেঁপে উঠে অত্যাচারী সরকার। সে আগুনে জাগে বাংলা—কলকাতা, ঢাকা, কুমিল্লা, মেদিনীপুর।

॥ কলকাতা ॥

পুলিশ কমিশনার টেগার্ট—আলিপুরের দায়রা জজ, ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্স, স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক ওয়াটসন আক্রমণ; রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ।

১৯৩০। লালদীঘি। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব। সাহেবের গাড়ির উপর বোমা পড়ল। অদূরে ফুটপাতের উপর শহীদ অনুজা সেন (খুলনা)-এর মৃতদেহ। টেগার্ট সাহেবের উপর বোমা ফেলতে গিয়ে বোমার টুকরায় তিনি নিহত হন।

খানিক দূরে তাঁর সঙ্গী দীনেশ মজুমদার (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা) ধৃত হলেন।

ডাঃ নারায়ণ রায়ের ল্যাবরেটরিতে পাওয়া যায় বোমা তৈরির মাল মশলা। বোমা দিয়ে সাহেব মেমদের আড্ডা, হোটেল, রঙ্গালয়, দোকান উড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

মামলা দায়ের হ'ল। মামলার নাম 'ডালহৌসি স্কোয়ার বোম্ব আউটরেজ' মামলা।

দীনেশ মজুমদারের যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়। মেদিনীপুর জেলা থেকে তিনি পলায়ন করেন।

চিত্রা বায়স্কোপের সামনে একটা বাড়িতে ছিল দীনেশ মজুমদার, হিজলী জেলের পলাতক বন্দী নলিনী দাস ও বিপ্লবী জগদানন্দ মুখার্জির গুপ্তবাস।

১৯৩৩ সনের জুনমাসের এক উষায় পুলিশের সহিত সংঘর্ষে তারা ধৃত হন এবং যাবজ্জীবন দীপান্তরের দণ্ডাজ্ঞা হয়। আলিপুর দায়রা জজের এজলাসে বিচার হয়। আলিপুর আদালতে এক বিপ্লবীর রিভলবারের গুলিতে এর জন্য প্রাণ দিলেন আলিপুরের দায়রা জজ। বিপ্লবীর নাম কানাইলাল ব্যানার্জি—জয়নগর—মজিলপুরের ছেলে। যুবক বিষপানে আত্মহত্যা করেন।…

১৯৩১ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বাংলার লাট জ্যাকসন সাহেবের উপর গুলি চালান স্নাতকা বীণা দাস। লাট সাহেব রক্ষা পান। বীণা দাসের ন'বছর জেল হয়।…

ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্সকে হত্যা করে মারা যান বিমল দাসগুপ্ত।…

১৯৩২ সনের জুন ও সেপ্টেম্বর মাসে স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক ওয়াটসনের উপর চলে আক্রমণ। জুন মাসে সেনহাটির অতুল সেন ওয়াটসনের উপর আক্রমণ করলেন। গুলি ব্যর্থ হয়। অতুল সেন বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

তারপর সেপ্টেম্বর মাসের একদিন সন্ধ্যায় ওয়াটসন যখন সস্ত্রীক দক্ষিণ কলকাতার দিক থেকে হাওয়া খেয়ে ফিরছিলেন তখন বিপ্লবী-দের একখানা মোটর তাঁর মোটরের সামনে গিয়ে ধাক্কা দেয় এবং ওয়াটসন সাহেবের অচল মোটরের ভিতরে গিয়ে গুলি চালান চারজন বিপ্লবী।

ওয়াটসন সাহেব, মেম ও ড্রাইভার রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে যান। তাঁরা সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছেন মাত্র।

তিনজন বিপ্লবী আত্মহত্যা করেন। চতুর্থ বিপ্লবী বিনয় রায় (মাদারিপুর) চন্দননগরে আশ্রয় নিলেন। চন্দননগরে ফরাসী সরকারের একজন জাঁদরেল কর্মচারী তাঁর হাতে নিহত হন।

কলকাতার বাইরে অবশেষে একদিন তিনি ধরা পড়েন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ ছিল না। পুলিশের হাতে তিনি নজরবন্দী হন।...

রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র বিনয় বসু, সুধীর গুপ্ত (ওরফে বাদল) দীনেশ গুপ্ত। এই আক্রমণে জেল সমূহের ইনসপেকটর জেনারেল সিমসন সাহেব নিহত হন।

সুধীর গুপ্ত বিষপানে আত্মহত্যা করেন। বিনয় বসু নিজের মাথায় রিভালবারের গুলি করেন। হাসপাতালে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবার জন্য তিনি মাথার ঘা ঘেঁটে সেপ্‌টিক করে তোলেন এবং পরে মারা যান। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয়।

॥ ঢাকা ॥

রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের নায়ক বিনয় বসু ঢাকার বিপ্লবী।

ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে ১৯৩০ সনে বিনয় বসু প্রমুখ বিপ্লবীদের গুলিতে বাংলার পুলিশের ইনসপেক্‌টর জেনারেল লোমান সাহেব নিহত হন এবং ঢাকার পুলিশ সাহেব হড্‌সন গুরুতর ভাবে আহত হন। বিপ্লবীরা গা ঢাকা দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন এবং একদিন দ্বিপ্রহরে সদলবলে বাংলা সরকারের খোদ দপ্তর রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করেন।...

ঢাকার ছেলেদের হাতে আরও দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটে।

ম্যাজিষ্ট্রেট কামাখ্যা সেনকে নিহত করে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরলেন কালিপদ মুখার্জি।

ঢাকা জয়দেবপুরের ছেলে ভবানী ভট্টাচার্য ও রবীন্দ্র ব্যানার্জি

১৯৩৪ সনে দার্জিলিং-এ লেবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে বাংলার অত্যাচারী লাট এণ্ডারসনের উপর গুলি চালান। অল্পের জন্য লাট সাহেব রক্ষা পান।

বিচারে উভয়ের ফাঁসির হুকুম হয়। ভবানী ১৯৩৫ সনের ২০ শে মাঘ রাজসাহী জেলে আত্মদান করেন। রবীন্দ্র ও ভবানী 'শ্রীসঙ্ঘ' এর বিপ্লবী।...

ঢাকার আই, বি'র পুলিশ সাহেব গ্রাসবি ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট 'ডুর্ণো'র উপর এবং ঢাকা বিভাগের কমিশনার ক্যাসেলের উপর ময়মনসিংহে আক্রমণ হয়।

॥ কুমিল্লা ॥

কুমিল্লায় সন্তরণ প্রতিযোগিতা হবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেনস প্রতিযোগীদের নাম গ্রহণ করছেন। তের চোদ্দ বছরের দুটি মেয়ে শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী সন্তরণে নামবার জন্য দুখানা আবেদন-পত্র রাখলেন ম্যাজিষ্ট্রেটের টেবিলের উপর। ম্যাজিষ্ট্রেট যখন মাথা নীচু করে আবেদনপত্র দুটো পড়ছেন তখন বালিকাদ্বয়ের হাতের রিভলবার গর্জে উঠল এবং আরাম-কেদারায় লুটিয়ে পড়ল ম্যাজিষ্ট্রেটের দেহখানা। মেয়ে দুজন শ্রীসঙ্ঘের সদস্যা।...

কুমিল্লার পুলিশ সায়েব এলিসন-ও নিহত হন বিপ্লবীদের হাতে। আততায়ী ধরা পড়ে না

কুমিল্লা ও ঢাকার কার্যকলাপে শ্রীসঙ্ঘ, বি. ভি অর্থাৎ বেঙ্গল-ভলানটীয়ার্স দলের অবদান বেশী। বি. ভি দলের দুঃসাহসিক কাজ ঘটে মেদিনীপুরে।

॥ মেদিনীপুর ॥

তিন ম্যাজিষ্ট্রেট খুন—পেড়ি, ডগলাস, বার্জ।

আইন অমান্য আন্দোলনে মেদিনীপুরের কৃষকদের উপর অকথ্য

অত্যাচার হয়। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার পণ করলেন বিপ্লবীরা। পরপর তিনজন ম্যাজিষ্ট্রেট খুন—পেডি, ডগলাস, বার্জ।

পেডির হত্যাকারী প্রকাশ্য স্থান থেকে পালাতে সক্ষম হন। ডগলাসের হত্যাপরাধে প্রদ্যোত ভট্টাচার্য্যের ফাঁসি হয়। বার্জকে হত্যা করতে গিয়ে বিপ্লবীদের সাথে দেহরক্ষীদের সংঘর্ষ হয়। অনাথ বন্ধু পাঞ্জা ও মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত নায়ক দুজন ছাত্র বিপ্লবীর হাতে বার্জ নিহত হন কিন্তু দেহরক্ষীদের গুলিতে নিজেরাও প্রাণ হারালেন। পরে ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তি, রামকৃষ্ণ রায় ও নির্মলজীবন ঘোষের ফাঁসি হয়।

অসহযোগ আন্দোলন স্তব্ধ, কংগ্রেস নীরব। মহাত্মাজীর হাতে চরকা, মুখে হরিজন প্রেম। নূতন শাসনতন্ত্র চালু করবার আয়োজন করছে সরকার। সারা ভারতের সেদিকেই চোখ।

শুধু বাংলায় চলছে বিপ্লব। ১৯৩৪ সন পর্যন্ত বিপ্লব চলল প্রবল ভাবে। ১৯৩৭ সন পর্যন্ত চলল তার স্তিমিত গতি।

শেষের কয়েক বছর চলে গুপ্তচর হত্যা, ডাকাতি আর ষড়যন্ত্র।

বাংলার তিন হাজার রাজবন্দী বকসা দুর্গে, হিজলী আর বহরমপুর বন্দী শিবিরে বন্দী। নির্যাতন, দুর্ব্যবহার আর কুৎসিত পরিবেশে তাঁদের স্বাস্থ্য হয়ে আসে ক্ষীণ। চালু হয় নূতন শাসনতন্ত্র-'মনটেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার'···প্রদেশিক স্বায়ত্ব-শাসন। কারাগারের দরজা খোলে। বন্দীরা মুক্তি পান।

এর পর আরম্ভ হল যুদ্ধ···দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সাম্রাজ্যলোভের এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে চায় না কংগ্রেস।

স্বাধীনতা আগে···তারপর সহযোগিতা।

ইংরাজের কূট-চালকে ব্যর্থ করে স্বাধীনতা লাভের জন্য সুরু করে তারা লড়াই।

ভারতের পথে পথে জাগে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'।

আর সুদূর সিঙ্গাপুর থেকে ভারতের পথে জাগে 'জয় হিন্দ' ধ্বনি। ঘরে বাইরে নূতন বিপ্লব,—বলিষ্ঠ গণবিপ্লব।

এই বিপ্লবের জোয়ারে আসে পরাধীনতার শিকল ভাঙবার শেষ ডাক।

॥ আট ॥

ভারতের অভ্যন্তরে বলিষ্ঠ গণবিপ্লব
—'ভারত ছাড় আন্দোলন' ও 'আগষ্ট বিপ্লব' (১৯৪২)

ভারতের বাইরে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যদের সংগ্রামী সংগঠন
—'আজাদ হিন্দ ফৌজ' আর 'দিল্লীচল' অভিযান (১৯৪৪-৪৫)

এল ১৯৪২ সন। সারা ইউরোপ জার্মানের জয়োল্লাসে মুখরিত। বিজয়ী জাপান দেশের পর দেশ জয় করতে করতে ভারতের দিকে অগ্রসর হয়। ভারতের সক্রিয় সহযোগিতা পাবার জন্য পার্লামেন্টের মন্ত্রী ক্রিপস মিটমাটের প্রস্তাব নিয়ে ভারতে আসেন।

২২শে মার্চ থেকে ১৩ই এপ্রিল (১৯৪২) পর্যন্ত ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে তাঁর আলাপ আলোচনা চলল। আগের মত এও যুদ্ধের শেষে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রুতিতে আর ভুলতে চান না ভারতের নেতারা। কংগ্রেস ও লীগ প্রত্যাখ্যান করল ক্রিপস প্রস্তাব।

সামনে যুদ্ধের বিভীষিকা,—তখনও ভারত পায়না নিজ ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের অধিকার। তখনও পুরাতন কূটনৈতিক চাল নিয়ে পায়তারা ভাজে ইংরাজ। কাজ হাসিল করবার আর ঠকাবার মতলব।

ক্রিপসের ফাঁদে গান্ধীজী পা দিতে চান না। ইংরাজের গৌর জন্য ভারতের ঘাড়ে যুদ্ধের কালিমা নামবে এ হ'ল তাঁর অসহ্য। সংগ্রাম ঘোষণা করলেন তিনি। পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবীতে তিনি তুললেন আওয়াজ—ভারত ছাড়।

॥ ভারত ছাড় আন্দোলন ॥

১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট। কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করল। সেদিন শেষরাত্রিতে ভারতের সকল নেতা গ্রেপ্তার হলেন। ইংরাজ মনে করেছিল সংগ্রামের সুরুতে নেতাদের বন্দী করলে থেমে যাবে আন্দোলন কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত।

ইংরাজের গোয়ার্তুমিতে ক্ষুব্ধ জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হ'ল। নেতৃত্বহীন আন্দোলনে চারিদিকে জ্বলল আগুন। সেই আগুন—বিয়াল্লিশের আগষ্ট বিপ্লব।

বিপ্লবের মূল কথা—সর্বতোভাবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসন অস্বীকার। ভারত শাসন করবার নৈতিক অধিকার ভারতবাসী ছাড়া আর কারো নাই। গায়ের জোরে যারা ভারত শাসন করতে চায় আগষ্ট বিপ্লবীরা তাদের হুকুম করল—ভারত ছাড় (Quit India)।

গণমানবকে এ বিপ্লব আহ্বান দিল—'বিদেশীর আইন অমান্য কর; শোষক শাসনের প্রতীক থানা, কাছারি দখল কর; —তার উপর উড়াও জাতীয় পতাকা। প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার স্থাপন করে নিজেদের শাসন ও বিচারভার নিজেরা গ্রহণ কর; অস্বীকার কর সর্বতোভাবে বিদেশী শাসন'।

চলল সংগ্রাম ভারতের দিকে। সংগ্রামীরা' ভাঙে আইন, চলে পিকেটিং মদের দোকানে, বিলাতী বস্ত্রের দোকানে। ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে চলে সভাসমিতি ও বক্তৃতা। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার কণ্ঠে জাগে ধ্বনি 'ভারত ছাড়'।

"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"—করব না হয় মরব। ছুটল মুক্তিপাগল মানুষদের দল। জাতীয় পতাকা নিয়ে চলে অসংখ্য নরনারীর শোভাযাত্রা। সৈন্যদের বুলেট বুকে করে অহিংসভাবে তারা দখল করতে থাকে থানা—কাছারি। থানা, কাছারির উপর জাতীয় পতাকা উড়ে। কাঁচা রক্তে প্রান্তর, পথ লাল হয়।

গ্রামে গ্রামে অচল বৃটিশ শাসন। বসে জাতীয় সরকার। মুক্তির স্বাদ পায় তারা। সৈন্য আসে, বুলেট চলে। অহিংস সংগ্রাম। রক্তে লাল হয় গ্রাম্যপথ।

ক্ষিপ্ত হয় জনতা। সাধারণ লোক তারা। অহিংসার ধার ধারে না। ক্ষিপ্ত জনতা রেললাইন উড়িয়ে দেয়, পুল ভেঙে ফেলে, স্টেশনে আগুন লাগায়, মিলিটারি লরী পুড়ে ছাই হয়।

॥ আগষ্ট বিপ্লব ॥

বাংলা সেদিন প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের প্রধান ঘাঁটি। সর্বত্র আমেরিকা ও বৃটিশ সৈন্যের ছাওনি। জাপানী আক্রমণ ও সুভাষ-চন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যকলাপের ফলে বাংলায় সেদিন মিত্রশক্তির বিপুল সামরিক আয়োজন। কলকারখানা সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে। এমন কি সারা বাংলা মুলুকটাই চলছিল সেদিন সমর নেতাদের ইঙ্গিতে। তার মধ্যেও যে বাংলা আগষ্ট বিপ্লবের মশাল উঁচু করে ধরেছিল সেইটুকুই বাংলার কৃতিত্ব।

আগষ্ট বিপ্লবের অন্তরায় বাংলায় যতটা ছিল অন্য প্রদেশে ততটা ছিল না। বিপুল সামরিক আয়োজন, দুর্ভিক্ষ, ঝড়, বন্যা বাংলাকে ছন্নছাড়া করল। তবুও বালিয়া, সাঁতারার মত বাংলার মেদিনীপুর সেদিন স্থাপন করল, প্রতিদ্বন্দ্বী স্বাধীন গ্রামরাজ্য। সীমান্তের মত বাংলার মেদিনীপুর সেদিন দেখাল অহিংসার গৌরব। অস্থিচিমুরের মত, গোপুর-ঢেকিয়াজুলির মত, কোরাপুটের মত মেদিনীপুর 'রক্ত তিলক ললাটে পরাল বন্দিনী জননীর'।

মেদিনীপুরের গৌরব ছাড়া বাংলার গৌরব রক্ত-স্নাত কলকাতার ছাত্র-ছাত্রীর আত্মাহুতি, শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের ধর্মঘট আর বালুরঘাট ও বীরভূমের চির মূক কৃষকদের অভ্যুত্থান।

* * *

১৩ই আগষ্ট (১৯৪২)। কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আসে লক্ষ লক্ষ ছাত্রের শোভাযাত্রা। অহিংস ছাত্রদের উপর চলল লাঠি। বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রাম-বাসে লাগায় আগুন, তাঁর কাটে। চলে অনবরত গুলি।

শ্রীমানী মার্কেটের কাছে আহত প্রথম শহীদ বৈদ্যনাথ সেনের পরদিন হাসপাতালে মৃত্যু হয়। উত্তেজিত জনতার সাথে চলে পুলিশ আর সৈন্যের সংগ্রাম। যথেচ্ছাচার গুলিতে শতাধিক লোক মরা যায়—বেশীর ভাগ নিরপরাধ পথচারী লোক। সাতদিন কলকাতার সাধারণ জীবনযাত্রা বন্ধ হয়।

এরপর আন্দোলনের গতি মন্থর হয়। প্রচারপত্র ও গোপন বেতার দ্বারা আন্দোলন জাগাবার চেষ্টা হয়।

ডাক বাক্স ধ্বংস প্রভৃতি নাশকতামূলক কাজ চলে। শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক ধর্মঘট হয়। জাপানী বোমা ও দুর্ভিক্ষের চাপে কলকাতা ও শহরতলীর আন্দোলন নষ্ট হয়।

পূর্ববঙ্গে ঢাকার আন্দোলন সবচেয়ে জোরালো হয়।

বীরভূমের বিদ্রোহী সাঁওতালরা বোলপুর স্টেশনে আগুন লাগায়। পুলিশ চালায় গুলি। সাঁওতালরা তীরধনুক নিয়ে যুদ্ধ করে।

বালুরঘাটের কৃষকরাও সরকারী ভবন আর কাগজপত্রে আগুন লাগায়। বাংলার কৃষক, মজুর আর তরুণ-তরুণী আগষ্ট বিপ্লবে এনেছে এক নূতন ঐতিহ্য।

॥ আগষ্ট বিপ্লবে মেদিনীপুর ॥

আর মেদিনীপুর! সারা ভারত একদিকে আর সাগর তীরে একা মেদিনীপুর। গান্ধীজির অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত নেতৃবৃন্দ অজয় মুখার্জি

(পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী), সুশীল ধাড়া (পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন বাণিজ্য মন্ত্রী), বরদা কুইতি, সতীশ সামন্ত, সতীশ সাহু গঠন করেন 'বিদ্যুৎবাহিনী' ও 'ভগিনী সেনাবাহিনী'। সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি এঁরা সুরু করেন 'থানা-অধিকার' আন্দোলন।

প্রথম 'থানা-অধিকার' আন্দোলন—২৮শে সেপ্টেম্বর: তমলুক থানা-অধিকার।

পুলিশের বুলেটে আহত কিশোর রামচন্দ্র বেরা গুলিজর্জরিত দেহ থানার দোর গোড়ায় টেনে নিয়ে, "থানা দখল করেছি" এই কয়টি কথা বলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

উত্তর দিক থেকে আসে আবার একটি শোভাযাত্রা। পুরোভাগে ৭৩ বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা। বৃদ্ধার হাতে জাতীয় পতাকা। দুটো গুলি এসে লাগল তাঁর হাতে। তবু বৃদ্ধা হাত শক্ত করে উঁচু রাখে পতাকা।

আহতা মাতা মাতঙ্গিনী পুলিশ ও সৈন্যদের মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিবার জন্য আহ্বান জানালেন।

প্রত্যুত্তরে তাঁর কপালে এসে লাগল গুলি। রক্তস্রোতের মধ্যে ঢলে পড়লেন জাতীয় পতাকা হাতে মাতঙ্গিনী হাজরা। তাঁর সাথে সাথে চিরনিদ্রায় অভিভূত হলেন উপেন্দ্র জানা, পূর্ণ মাইতি, রামেশ্বর বেরা, বিষ্ণু চক্রবর্তী, ভূষণ জানা, নগেন সামন্ত আর তিনজন কিশোর—লক্ষ্মী দাস, জীবন বেরা, পুরী প্রামাণিক।

পরদিন ২৯শে সেপ্টেম্বর—মহিষাদল থানা অধিকার। এ অভিযানে নেতৃত্ব করেন তমলুকের অন্যতম বিপ্লবী নায়ক সুশীল ধাড়া। মহিষাদল রাজার পাঠান দেহরক্ষীর গুলিতে দুজন শোভাযাত্রী নিহত হন।

গুলিবৃষ্টির মধ্যে অগ্রসর হয় জনতা। অসহনীয় গুলির মধ্যে থেমে যায় শোভাযাত্রা। সেদিনকার শহীদ—ভোলা মাইতি, সুরেন মাইতি, হরি দাস, পঞ্চানন দাস, যোগেন দাস, আশু কুলিয়া, সুধীর

হাজরা, প্রসন্ন ভূইয়া, দ্বারকানাথ সাহু, গুণধর হাণ্ডেল, রাখাল সামন্ত, ক্ষুদিরাম বেরা।

ঐদিন সুতাহাটা থানা অধিকার করে চল্লিশ হাজার লোকের এক জনতা। জনতা থানার লোকদের বন্দী করে থানার অস্ত্র-শস্ত্র হস্তগত করে এবং থানায় আগুন দেয়।

ঐদিন ঐভাবে পটাশপুর, খেজুরি ও ভগবানপুর থানা অধিকৃত হয়। কর্মচারীরা বন্দী হয় এবং পরে সুন্দরবনে পরিত্যক্ত হয়। থানায় অগ্নিসংযোগ হয়।

পরদিন ৩০শে সেপ্টেম্বর—নন্দীগ্রম থানার পালা। ব্যর্থ হয় অভিযান। অভিযানে প্রাণ দেন আলাউদ্দিন, বিহারী করণ, পুলিন প্রধান, বিহারী হাজরা, পরেশ গিরি।

মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি ও তমলুক মহকুমা আগষ্ট বিপ্লবের পীঠস্থান। আগষ্ট আন্দোলনের প্রারম্ভে নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে হয় সভা আর হরতাল। ছাত্ররা ছাড়ল স্কুল-কলেজ, উকিল-মোক্তার ছাড়ল আদালত। চৌকিদার দেয় কাজে ইস্তফা, জনতা রাস্তাঘাট নষ্ট করে। থানা অধিকার করে।

সরকারী নির্যাতন হয় চরম। গুলি চলে—মরে কত তরুণ, কত কিশোর। নারী-শিশুর উপর চলে অত্যাচার, আর হয় জরিমানা। চলে লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ।

গ্রামের লোকদের জোর করে রাস্তার কাজে লাগান হয়।

২২শে সেপ্টেম্বর (১৯৪২) তারিখে এই নিয়ে গ্রাম্য লোকদের সঙ্গে পুলিশের তমলুকে সংঘর্ষ হয়। পুলিশ চালায় গুলি। প্রাণ দেন তমলুকে ছ'জন—যামিনী কামনা, কুঞ্জ সিট, সর্বেশ্বর প্রামাণিক, চন্দ্র জানা, অনন্ত পাত্র, শ্যামানন্দ দাস। কাঁথিতেও জোর করে রাস্তা মেরামতের কাজে গ্রাম্য লোকদের লাগাতে গেলে গ্রাম্য লোকদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়।

চৈতগড়ে পুলিশের গুলিতে মরেন ১লা অক্টোবর তারিখে অমূল্য শাসমল, সুধীর মাইতি।

২২শে সেপ্টেম্বর বেলবনীতে গুলির মুখে প্রাণ দেন দশ জন। ২৯শে অক্টোবর ভগবানপুরে প্রাণ দেন ষোল জন। ১৩ই অক্টোবর অলনগিরিতে প্রাণ দেন দুজন। পটাশপুর থানায় অক্টোবর মাসে তিন দিনে গুলির মুখে প্রাণ দেয় তিন জন।

আন্দোলনের মধ্যে কাঁথি-তমলুকের বুকে নামে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ১৬ই অক্টোবর—ঝড় বন্যা এবং তার ফলে দুর্ভিক্ষ। এই অমানিশার অন্ধকারে আগষ্ট বিপ্লবী কাঁথি-তমলুক নিশ্চেষ্ট ছিল না।

অক্টোবর মাসে কেশবপুর থানায় কেটুয়া গ্রামের লোকেরা পুলিশের হাত থেকে বন্দীদের মুক্ত করে এবং অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেয়।

আনন্দপুর থানায় সাবরেজিষ্টারি অফিসে আগুন লাগাতে গিয়ে জনতা পুলিশের সংঘর্ষে অনেক লোক প্রাণ হারায়—তন্মধ্যে ছিল একটি নারী ও দুটি শিশু।

মোহনপুর ও সবং থানায় চলে জনতার অভিযান।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'জনতার সরকার' তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। ঝড়-বন্যায় (১৬ অক্টোবর—১৯৪২) দুর্গত মানুষের সেবা-কার্যের মধ্যে এই সরকার স্থাপিত হয় ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪২। এই সরকারের জনপ্রিয় কার্যকলাপের ফলে দু বছর বৃটিশ সরকারের কোন অস্তিত্ব থাকে না।

'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের' সৈন্য ও পুলিশ ছিল। ছিল গুপ্তচর বিভাগ। আর ছিল নিজস্ব কারাগার, আদালত ও আইন সভা। আদালতে চোর, ডাকাত ও দেশদ্রোহীদের দণ্ড হ'ত।

আগষ্ট বিপ্লবের আগুনে সর্বনাশা রূপ নিয়ে জেগেছিল মেদিনীপুর, কাঁথি ও তমলুক। সেই জাগরণ ধ্বংস করতে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে অমানুষিক অত্যাচার সুরু হয়।

আন্দোলনের আগুনে পুড়ে মেদিনীপুর সেদিন খাঁটি সোনায়

পরিণত হয়। একদিকে বুলেট, অন্যদিকে মুক্তি কামনা। মুক্তি কামনার কাছে বুলেট মেনেছে হার। ভারতের আগষ্ট বিপ্লবের ইতিহাসে মেদিনীপুরের নাম সবচেয়ে সমুজ্জ্বল। কৃষকের রক্তস্নাত মেদিনীপুর, তোমায় প্রণাম।

সুভাষচন্দ্র

বিদেশী শক্তির সাহায্যে দেশ স্বাধীন করবার প্রচেষ্টা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে।

১৯১৫সনের সে ব্যর্থ বিপ্লবের কথা আমরা জানি। সুভাষচন্দ্র তখন কিশোর ছাত্র। সম্মুখে সংগ্রামের সেই প্রেরণার মাঝে গড়ে উঠে তাঁর বৈপ্লবিক মনোভাব ও রাজনীতিক-জীবন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই মেধাবী, প্রতিভাবান যুবক আই. সি. এস. চাকুরীর মোহ ত্যাগ করে দেশবন্ধুর পাশে এসে দাঁড়ালেন। গান্ধীজী ও অহিংসা আন্দোলনের উপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু আপোষ আর সংগ্রাম বিমুখতার বিরুদ্ধে তিনি সব সময় বিদ্রোহ করেছেন। বামপন্থী ভারত এসে দাঁড়াল তাঁর পিছনে।

১৯৩৮ সনে হরিপুরা কংগ্রেসে ও ১৯৩৯ সনে ত্রিপুরী কংগ্রেসে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। এবার গান্ধীজীর সমর্থন না থাকায় তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং বামপন্থী কংগ্রেসীদের নিয়ে তিনি গঠন করলেন 'ফরওয়ার্ড ব্লক'।

কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি তাঁর উপর তিন বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করল।

বাংলা দেশে তখন লীগ মন্ত্রীসভা।

সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত দেশ।

হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য তিনি 'হলওয়েল মনুমেন্ট' অপসারণের আন্দোলন সুরু করলেন। ১৯৪০ সনের ২রা জুলাই তারিখে

সুভাষচন্দ্র ভারত-রক্ষা আইনে বন্দী হন। কারাগারে তিনি অনশন ব্রত অবলম্বন করেন। স্বাস্থ্যহানির জন্য তিনি গৃহে অন্তরীণ হলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুনে তখন সারা ইউরোপ জ্বলে।

ব্রিটিশের শত্রুপক্ষের সহায়তায় ভারতের মুক্তি আনয়ন হ'ল সেদিন সুভাষের স্বপ্ন।

অন্তরীণ অবস্থায় তিনি ইউরোপে পালাবার আয়োজন করলেন এবং অবশেষে ১৯৪১ সনের জানুয়ারী মাসের শেষে একদিন তিনি ছদ্মবেশে বাংলাদেশ ত্যাগ করলেন। কাবুলে পৌঁছে তিনি সেখান থেকে মস্কো যাত্রার জন্য সচেষ্ট হ'লেন। সহসা তাঁর যাত্রাপথে খবর এল সোভিয়েট রাশিয়া জার্মানীর পক্ষ ত্যাগ করে মিত্রপক্ষে যোগদান করেছে। ইংরাজের বিপক্ষে তখন ইটালি, জার্মানি ও জাপান। সুভাষ চললেন বার্লিনের পথে। ১৯৪২ সনের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে স্বাধীনতা দিবসে হামপসবারগে সুভাষ—'স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী' গঠন করলেন। এতে যোগ দিল মিশর ও লিবিয়ার রণক্ষেত্রে বন্দী ভারতীয় সৈন্যরা। প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা সুভাষের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

এই সম-সময়ে মালয়ের যুদ্ধে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে মোহন সিং গঠন করলেন 'ভারতীয় জাতীয় বাহিনী' কুয়ালামপুরে। সিঙ্গাপুরের পতনের পর আত্মসমর্পণ করল ইংরাজ ও অধীনস্থ পঞ্চাশ ষাট হাজার ভারতীয় সৈন্য। খাদ্যাভাবের জন্য জাপানীরা তাদের মুক্তি দিল এবং মোহন সিং এর হাতে সমর্পণ করল।

ফারার পার্কের সভায় মোহন সিং এদের জাতীয় বাহিনীতে নিলেন।

কিছুদিন বাদে ব্যাঙ্ককে প্রবাসী ভারতীয়দের অধিবেশন বসে।

ব্যাঙ্ককের এই সভায় গঠিত হ'ল 'ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ', 'ভারতীয় জাতীয় বাহিনী', 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ', "কর্মপরিষদ"।

ফৌজের অধিনায়ক হলেন মোহন সিং, আর কর্মপরিষদের সভাপতি হ'লেন রাসবিহারী বসু।

রাসবিহারী বসু ১৯১৫ সনের বিপ্লব আন্দোলনের একজন কর্মী। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর উপর বোমা ফেলবার ষড়যন্ত্রের মামলায় পুলিশ যখন তাঁকে খুঁজছিল তখন তিনি পালিয়ে চলে যান জাপানে।

চলে সংগ্রামের বিপুল আয়োজন।

সেদিন ছিল চরম আঘাত হানবার সুবর্ণ-লগ্ন। ভারত সীমান্ত তখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত কিন্তু স্বার্থপর জাপান অভিযানে উৎসাহ না দিয়ে 'আজাদ-হিন্দ ফৌজকে' নিজের কাজে লাগাতে চাইল।

মোহন সিং অধীর হ'লেন।

রাসবিহারী বসু বললেন—সবুর করুন। দেখা যাক।

এ নিয়ে দুই নেতায় মনোমালিন্য ঘটে। মোহন সিং ফৌজ ভেঙে দিলেন। জাপানীরা তাঁকে গ্রেফ্‌তার করল। ১৯৪২ সনের প্রারম্ভ থেকে ১৯৪৩ সনের মাঝামাঝি পর্যন্ত আয়োজনই চলল—অভিযানের রূপ নিল না।

সেদিন যদি অভিযান সুরু হ'ত—ইতিহাসের চাকা ঘুরে যেত কিন্তু জাপানীদের কারসাজিতে আন্দোলন ব্যাহত হ'ল।

অবশেষে অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখা গেল। সুভাষচন্দ্র ইউরোপ থেকে এসে পৌঁছালেন ১৯৪৩ সনের ২রা জুলাই তারিখে। মরা গাঙে আবার বান এল। ভারতীয়দের মধ্যে এল প্রবল উদ্দীপনা।

'ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর' সর্বকর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন সুভাষ। দলে দলে ভারতীয় যোগ দিল পুনর্গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজে। মহিলারাও এসে যোগদান করেন।

লক্ষ্মী স্বামীনাথনের নেতৃত্বে নারীবাহিনী গঠিত হ'ল 'ঝাঁসির রাণীবাহিনী'

কিশোররাও পিছনে পড়ে থাকে না। তাদের নিয়ে তৈরী হয়, 'আত্মঘাতী বালসেনা' বাহিনী।

'স্বাধীন আজাদহিন্দ্' সরকার স্থাপিত হ'ল।

সুভাষের মহান ব্যক্তিত্বে মানুষের মনের সকল দৈন্য ঘুচে গেল। সর্বস্ব পণ করে দেশের সেবায় দাঁড়াল এক লক্ষ প্রবাসী ভারতবাসী। সুভাষের কণ্ঠের সাথে লক্ষ কণ্ঠে আওয়াজ উঠল—চল দিল্লী।

১৯৪৪ সন। 'আজাদহিন্দ' ফৌজ রেঙ্গুন পার হ'ল। আরাকানের পাহাড়, জঙ্গল, নদী অতিক্রম করে এগিয়ে চলে ফৌজ। ১৮ই মার্চ তারিখে তারা ব্রহ্ম সীমান্ত পার হয়ে এল ভারতের মাটিতে। কোহিমা দখল করে তারা ঘিরে ফেলল, ইম্ফল—মণিপুরের রাজধানী।

১৮ই এপ্রিল। ভারতের পবিত্র মাটিতে উড়ল জাতীয় পতাকা। কোহিমায় বসল জাতীয় সরকার। মুক্তির স্নিগ্ধ হাওয়া ঢেউ তুলল পরাধীন ভারতের দোরে। মুক্তিসংগ্রামের কাহিনী এখানেই থামে। এল প্রবল বর্ষা। দুর্গম রাস্তার জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য আসে না। রেঙ্গুনস্থ আজাদহিন্দ ফৌজের প্রধান ঘাঁটি থেকে জাপানের প্রতিশ্রুত বিমানও আসে না।

ইম্ফলের অবরোধ তুলে পিছু হটল জাতীয়বাহিনী। সুভাষ চন্দ্রের স্বপ্ন ও সাধনা—দিল্লীর পথে অভিযান এখানেই চিরতরে থেমে যায়।

এর পরের কাহিনী দেড়বছরের কাহিনী। বাধার পর বাধা, নিরাশার পর নিরাশা—তবু তারা নেতাজীর স্বপ্নে পাগল। খাবার নেই। গাছের পাতা, মাঠের ঘাস খাদ্য। মাথার উপর শত্রুপক্ষের বিমান, বোমার গর্জন। পিছু হটে আজাদহিন্দ্ ফৌজ। এ দীর্ঘ পথযাত্রার সাথে তুলনা হয় চীনের লঙ্ মার্চের। নূতন সংগ্রামের কামনা নিয়ে চলে। ভারত মাতার শিকল ভাঙবার সাধনায় ব্রতী সন্তানদের খাদ্য নাই। আর সোনার ভারতের খাদ্য লুট করে সেদিন ইংরাজ শিবিরে জমা হয়েছে বস্তা বস্তা ময়দা, টিন টিন ঘি। লোভে পড়ে দু'এক জন সৈন্য দল ত্যাগ করল। আজাদহিন্দ্ ফৌজ তবু দমে না।

কুখাদ্য খেয়ে সৈন্যদের স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। সৈন্যরা দলে দলে ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

ভ্রাম্যমান হাসপাতালে ঝাঁসির রাণী বাহিনীর সেবিকারা পীড়িত-দের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে। ঔষধ অপ্রচুর, হাসপাতালের সাজসজ্জা সামান্য, তবু এই সেবিকাদের সেবায় বেশীরভাগ পীড়িত আরোগ্য লাভ করে। সেবিকাদের মধ্যে বাঙালী বালিকা ষোড়শী কুমারী বেলা দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সেবারতা কুমারী নাইটিঙ্গেলের মত কুমারী বেলার নাম আমাদের ইতিহাসে চিরকাল অনির্বাণ থাকবে।

১৬ই আগষ্ট। ১৯৪৫ সন। নাগাসকি ও হিরোসিমায় এটম বোমা পড়ায় জাপান মিত্র শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে।

সুভাষচন্দ্র ব্যাঙ্কক ত্যাগ করলেন।

অনেকে বলেন যাত্রাপথে বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা পড়েছেন। আবার কেহ কেহ বলেন, বৃহত্তর বিপ্লব সাধনায় কোথাও না কোথাও তিনি আত্মগোপন করে আছেন।

দীর্ঘ অন্তর্ধানের জন্য আমাদের ইদানীং প্রতীতি জন্মেছে যে তিনি আর জীবিত নাই।

ব্যর্থ হ'ল আজাদহিন্দ্ ফৌজের সংগ্রাম। নিষ্ঠুর এ ব্যর্থতার মধ্যে জাতি পেল শিকল ছিড়বার অদম্য ইচ্ছা······দেশ পেল এক মহাজাগরণ।

ইংরাজ শাসন টলমল করে উঠল।

পরবর্তী নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী (১৯৪৫-৪৬) কলকাতার রাজপথে আর বোম্বাই এর সাগর কূলে বিপ্লব হয়।

তারই ফলে ইংরাজ বিদায় নিল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে। পরাধীনতার হাত থেকে ভারত মুক্তি পায়।

যুদ্ধের গতি ফিরে যাচ্ছে—জাপানের হারবার পালা সুরু হ'ল। রেঙ্গুনের পতন ঘটল ইংরাজবাহিনীর কাছে।

১৪ই এপ্রিল রেঙ্গুনের পতন ঘটে।

রেঙ্গুন ছিল আজাদহিন্দ ফৌজের প্রধান ঘাঁটি। রেঙ্গুনের পতনে ফৌজের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।

ভারাক্রান্ত অন্তরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুন ত্যাগ করে ব্যাঙ্ককের ঘাঁটিতে এসে পৌঁছালেন।

শাহনওয়াজ, সাইগল প্রভৃতি প্রায় সকল সেনানায়ক ইংরাজ শিবিরে আত্মসমর্পণ করলেন।

শুধুমাত্র ঠাকুরসিং এর সৈন্যদল ব্যাঙ্ককে, আর ঝাঁসীররাণী বিগ্রেড মৌলমেনে নিরাপদে পৌঁছাতে সমর্থ হল।

ইম্ফল ছাড়ার পর বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দীর্ঘ পথযাত্রার এই পরিণতি ঘটল।

॥ নয় ॥

মুক্তি সংগ্রামের শেষ আঘাত

ছাত্র বিদ্রোহ ও

নৌ-সেনানীর বিদ্রোহ (১৯৪৫-৪৬)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

সেদিন চলছে বাংলায় সৈন্যদের রাজত্ব। যুদ্ধের জন্য ভারতের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার শুষছে ইংরাজ। দালাল ব্যবসাদাররা কেড়ে নিল মুখের অন্ন। কালবাজারে দেশের চাল বিক্রি হয়। ক্ষুধিত মানুষ—স্ত্রী, পুরুষ, শিশু অনাহারে মরল রাজপথের উপর।

মানুষ হারাল মনুষ্যত্ব। কলুষিত সমাজে উঠল শিয়াল কুকুরের রব। এর উপর এল বিধাতার রোষ—প্রাকৃতিক দুর্যোগ—মেদিনীপুরে ঝড় ও বন্যা।

এর উপর একদিকে জাপানের বোমার ভয়, অন্যদিকে সামরিক শাসনের রুদ্র রূপ।

কাপড়, চাল দুষ্পাপ্য। সর্বত্র কণ্ট্রোল আর লাইন। পথে ঘাটে রেলে মানুষের হুড়োহুড়ি। অতিষ্ঠ বাঙালীর জীবন।

সেদিন আমাদের এ তিক্ত গোলামির হাত থেকে মুক্তি দিতে এসেছিল সুভাষের আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। আমরা সেদিন কাঁকর চাল আর রেশনের কাপড় যোগাড়ে বিব্রত। সে সব খবর রাখিনি সেদিন আমরা।

বিধাতার বিধানে জিতল ইংরাজ। নিষ্প্রদীপ শহরে শহরে জ্বলে আলোর মেলা। কালবাজারে ধনীদের ঘরে আনন্দের খেলা। নিঃস্ব মধ্যবিত্ত, শোষিত কৃষক মজুরের ঘরে তৈলহীন প্রদীপে স্তিমিত অন্ধকার।

যুদ্ধ শেষ হ'ল। সাধারণ মানুষের চোখের সামনে ভাসে আশা —এবার বোধ হয় খাওয়া পরার কষ্ট শেষ হ'ল। হায় আশা!

সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে ইংরেজ শাসক মাথা ঘামায় না। লাল কেল্লায় সেদিন তারা বিদ্রোহী আজাদহিন্দ ফৌজের নায়কদের বিচার করে।

এই বিচারের সূত্রে আজাদহিন্দ ফৌজের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী সাধারণে প্রকাশ পায়। দেশময় অভূতপূর্ব উদ্দীপনা দেখা দেয়।

সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত কংগ্রেস নায়কগণ জনগণকে শান্ত করেন।

কংগ্রেস আজাদহিন্দ ফৌজ ডিফেন্স কমিটি গঠন করল।

বিদ্রোহী সেনানায়কদের পক্ষে ব্যবহারজীবি দাঁড়ালেন ভুলাভাই দেশাই আর জহরলাল।

* * *

১৯৪৫ সনের নভেম্বর মাস।

লালকেল্লার কাঠগড়ায় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও নরহত্যার অভি-যোগে অভিযুক্ত মুক্তি সংগ্রামের নায়ক শাহনওয়াজ, সাইগল, ধীলন

বিচারকদের সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষা করছেন। জাতির বেদনা আগুনের হল্‌কায় ফেটে আসতে চায়।

২১শে নভেম্বর তারিখে কলকাতায় ছাত্ররা সেনানায়কদের মুক্তির দাবীতে শোভাযাত্রা বার করে। জনসাধারণও তরুণদের পাশে এসে দাঁড়ায়। পুলিশ ও সৈন্য ধর্মতলার মোড়ে শোভাযাত্রায় বাধা দিল। জনসাধারণ এগোতে চায়—পুলিশ এগোতে দিতে চায় না, কিন্তু ছাত্ররা নাছোড়বান্দা…তারা এগোবেই।

জনসাধারণের সেদিন অদম্য জেদ। নেতাজীর কাহিনী তাদের বুকে দিয়েছে অসীম বল। যুদ্ধান্তে সারা পৃথিবীতে এনেছে স্বাধীনতার আগ্রহ। সেই আগ্রহের ঢেউ এসেছে এদের অন্তরে। তারা অচল …অটল।

অগ্রসর হয় ছাত্রদল। সঙ্গে জনসাধারণ। গুলি চলল।

জাতীয় পতাকা হাতে রামেশ্বর ব্যানার্জি কলকাতার রাজপথে চিরতরে ঘুমালেন। ঘুমালেন রামেশ্বর কিন্তু জাগল সারা কলকাতা।

সারা রাত হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ ছাত্র, নাগরিক জেদ ধরে পড়ে থাকে সেই রাজপথের উপর। তাদের কণ্ঠে ডালহৌসির নিষিদ্ধ অঞ্চলে চলবার আওয়াজ। বিক্ষুব্ধ জনতার উন্মত্ততায় পুড়তে থাকে বাস, ট্রাম।

স্কুল, কলেজ, কলকারখানা, দোকান পাট সব বন্ধ।…

সাম্রাজ্যবাদীর বুলেটের সামনে বহু প্রাণ বলি হয়। আব্বাস সালামের পিছু পিছু অনেক নিষ্প্রাণ দেহ মাটির ধুলি চুম্বন করল। শিকল পূজার পাষাণ বেদীতে লাগল কাঁপন। সেদিন কলকাতায় তরুণদের পাগলামির আহ্বানে ক্ষেপে উঠল বাংলাদেশ।

নূতন বছর। ১৯৪৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাস। লাল কেল্লায় বিচার চলে। রসিদ আলি, সিঙ্গারা সিং আর ফতে খাঁর দণ্ডের প্রতিবাদে হিন্দু, মুসলমান ছাত্র ও নাগরিকদের শোভাযাত্রা

উত্তাল করল কলকাতার রাজপথ। রক্তের হোলিরাগে চঞ্চল হ'ল সারা কলকাতা।

বৃটিশ শাসকের সম্বল বেয়নেট। নবজাগ্রত ভারত ভয় করে না আর। জাগ্রত, নির্ভীক ভারতের বুকে জাগে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ।

মাঠে জাগে কৃষক, কলকারখানায় মজুর, শহরে শহরে জাগে তরুণ কিশোর ও যুবক। জনসাধারণের মধ্যে এ বিক্ষোভ সীমাবদ্ধ থাকে না। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সামরিক, নৌ ও বিমান বাহিনীর ভিতর।

বোম্বাই সমুদ্র উপকূলে ভাসে 'তলোয়ার' জাহাজ। জাহাজের টেলিগ্রাফিষ্ট পি. সি. দত্ত জাহাজের দেয়ালে লিখে রাখেন "জয় হিন্দ্" ও 'ভারত ছাড়'। এ লেখা অ্যাডমিরাল গডফ্রের চোখে পড়ল। পি. সি. দত্ত বরখাস্ত হলেন। নৌ-সেনানীরা বিদ্রোহী হয়। বোম্বাই পোতাশ্রয়ের জাহাজ বিদ্রোহী নৌ-সেনানীরা দখল করল।

নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনে বোম্বাই রাজপথে জাগল গণবিক্ষোভ। করাচীর সমুদ্রোপকূলে ও কলকাতার ডকে লাগল বিদ্রোহের ঢেউ।

সেদিন সাধারণ মানুষের সে বিদ্রোহে দর্পি ইংরাজের সামরিক ও বিমান বাহিনী চঞ্চল হ'ল। শোনিত সাগরে ভাসল দেশ। ইংরাজ শাসন হ'ল অচল। ভারত ছাড়বার জন্য তৈরী হ'ল বিদেশী শাসক।

নূতন নির্বাচনে ভারতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ জয়লাভ করল। এটলী কংগ্রেস ও লীগকে মুক্তির সনদ গ্রহণ করবার জন্য আহ্বান জানালেন।

শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা সাথে নিয়ে ভারতে এল মন্ত্রীমিশন। ভারতবর্ষকে দেওয়া হ'ল উপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন। এক বছর পর কমন ওয়েলথের সাথে সম্পর্ক ছেদের ব্যবস্থা থাকল। রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার হাতে থাকবে দেশরক্ষা, যানবাহন ও বৈদেশিক বিষয়। অন্যান্য বিষয়গুলির ভার পাবে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা।

মুসলিমলীগ প্রথমে এ বিধান গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগদান করে কিন্তু কংগ্রেসের সাথে মতানৈক্য হওয়ায় তারা পরে উহা বর্জন করে এবং আলাদা 'পাকিস্থান রাষ্ট্র' দাবী করে।

এই দাবী নিয়ে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে লীগ সুরু করল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। লীগ সরকারের সহায়তায় লীগের লোকেরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অন্তরালে হিন্দু নরনারীর উপর সুরু করল অত্যাচার। ভীতির দ্বারা কংগ্রেসকে 'পাকিস্থান' প্রস্তাবে অর্থাৎ ভারতবিভাগে সম্মত করান এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উদ্দেশ্য।

সপ্তাহকালব্যাপী দাঙ্গায় কলকাতার রাজপথ হ'ল শবাকীর্ণ। দাঙ্গা ছড়াল নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে। নেতারা চিন্তিত হলেন। তাঁরা অগত্যা ভারত বিভাগে সম্মতি দিলেন।

বেদনাদায়ক হত্যালীলায় বড়লাট ওয়াভেল নির্বিকার অথচ এজন্য দায়ী তাঁর বিভেদ-নীতি। হিন্দু-মুসলমান দেশপ্রেমিকদের বিক্ষোভের সীমা থাকে না। ওয়াভেলের বদলে মাউণ্ট ব্যাটেন ভারতে এলেন।

কংগ্রেস ভারত বিভাগে সম্মত হ'ল। পার্লামেণ্টে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল পাশ হ'ল।

রক্তারক্তিতে ছ'মাস অতিবাহিত হয়। ছু' মাস মিটমাটে চলল।

অবশেষে ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট তারিখে পূর্ববঙ্গ ও শ্রীহট্ট, সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব ও বেলুচিস্থান নিয়ে গঠিত হ'ল পাকিস্তান। আর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে থাকে বাকি অঞ্চল।

দেশীয় রাজ্যের বেশীর ভাগ ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করে। এই ছুই রাষ্ট্রের হাতে বৃটিশ শাসনভার অর্পণ করে।

হিমালয় থেকে কুমারিকা, কর্ণফুলি থেকে করাচী বেদনা মুক্তির আনন্দে উদ্বেলিত হ'ল।

প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও দেশের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সমাজের সমস্যার কোন সুরাহা হয় না। সেই পুরাতন আমলা-তান্ত্রিক ধাঁজের শাসন, সেই ধনতান্ত্রিক পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী আইনের নামে পুলিশী ও সামরিক নির্যাতন, অর্থলোলুপ স্বার্থবাদী নেতাদের হীন উপদল পোষণ, ধনতান্ত্রিক দুর্নীতির প্রশ্রয় দান এবং জনস্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপে কংগ্রেস জনসাধারণের আস্থা হারায়।

চীন-ভারত সংঘর্ষ (১৯৪৬) ও পাক-ভারত সংঘর্ষ (১৯৪৭)-এর জন্য দেশরক্ষার প্রশ্নে তৃতীয় নির্বাচনের পরীক্ষায় কংগ্রেস উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয় কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্রেসের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা জহরলাল, বিধান রায় এবং লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় ও সাধারণ মানুষের অধিকতম সমর্থনে বামপন্থীদলগুলির মধ্যে ক্রমশঃ সন্তোষ-জনক বুঝা-পড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ায় কংগ্রেসের আসন ভারতের সর্বত্র টলমল হয়।

চতুর্থ নির্বাচনে এবং পরবর্তী অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বাংলার জনগণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এবং সম্মিলিত বামপন্থী দলগুলির ফ্রন্ট 'যুক্তফ্রন্ট' পক্ষে রায় দিয়েছে। শ্রমিক কৃষকের মিতালীতে মেহনতী মানুষের এই রায় এই ত' গণতন্ত্র। আমরা বুদ্ধিজীবি মানুষ জোর করে ধনতন্ত্র মার্কা গণতন্ত্র স্বীকার করি না—মানি না "ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রক্তঝরা বিকলাঙ্গ গণতন্ত্র।"

সত্যিকার গণতন্ত্রের যারা দুষমন তাদের সম্পর্কে সতর্ক হবার দিন এসেছে এবার। চারিদিকে অন্নের হাহাকার, দলাদলি আর তারুণ্যের বিকৃত রুচি ও উচ্ছৃঙ্খলতা আজ প্রবল। ধনতান্ত্রিকদের সৃষ্ট এই দুরবস্থার অবসরে ধনতান্ত্রিকগণ অর্থনৈতিক বাজারে দুর্নীতি ও সিনেমা মারফৎ অশ্লীলতার বাহুল্যের প্রচার করছেন। তারই ফলে এক শ্রেণীর বাঙালী তরুণ পোষাকে, ব্যবহারে ও চালচলনে ডলারের ময়লা ড্রেন ধোওয়া বিকৃত রুচি নিয়ে অহমিকা আর উল্লাসে মাতোয়ারা। সেদিন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি ২৪ পরগণা শাখার

মহীরামপুর সম্মেলনে (১৯৪৯) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে আজীবন নির্যাতিত দেশকর্মী যতীশ রায় তাঁর ভাষণে আমাদের সতর্ক করেছেন।

"...আজ দেশজোড়া ছাঁটাই বেকারীর বিভীষিকার বিরুদ্ধে শ্রমিক কৃষকের মিতালীতে মেহনতী মানুষ সংগ্রামে সামিল। আর শোষকশ্রেণী নানান চক্রান্তের জাল সৃষ্টি করে তা ধ্বংস করার জন্য বদ্ধ পরিকর। তারই অংশ হিসাবে দেশজোড়া এক বিকৃত সংস্কৃতির কলুষ ছড়িয়ে তাঁদের ভাড়াটে শিল্পী, সাহিত্যিক যুব-মনকে সংগ্রাম বিমুখীন করার চক্রান্তে লিপ্ত।......"

তাই—চলেছে মিছিল—সাধারণ মানুষের মিছিল। মিছিল চায়—

"নতুন সমাজ—নতুন হৃদয়—নতুন কবিতা মিছিল চায়,
ক্ষুধার মিছিল, দাবীর মিছিল, মৌন মিছিল
—মিছিল যায়।"

মিছিলের চলা ও চাওয়া মিথ্যা নয়। এইত তার পথ চলার সুরু।

১৯৫৯ সাল। বাংলায় বিকৃত কংগ্রেসের পতন হয়। সম্মিলিত বামপন্থীদের যুক্তফ্রণ্টের হয় উত্থান। এইত মিছিলের যাত্রাক্ষণ।

শরিকে শরিকে হানাহানি দেখে ভয় খাচ্ছেন? ও কিছু নয়। বৃষ্টি হবার আগে মেঘে মেঘে ত লড়াই হয়। তেমনি আসছে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব। তারপর আসবে সর্বহারার জয়!

মিছিল।

ভাবছেন? ভাববার কিছু নাই। হয়ত আসতে পারে রক্তাক্ত বিপ্লব! পৃথিবীর ইতিহাসে অলস আরামী শান্তি মিথ্যা। সত্য ইতিহাসের গতি।

ইতিহাসের গতিকে ত কেউ গতিরোধ করতে পারে না।

* * *

১৯৫৯। খেত-খামারে, কলকারখানায়, আপিসে, বিদ্যায়তনে বিপ্লবের সেদিন মহাসমারোহ। বিপ্লবের জয়পত্র ললাটে পরে জয়যাত্রায় ছুটল সেদিন ইতিহাসের ঘোড়া। সম্মুখে যেন তার রাজসূয়—অশ্বমেধ যজ্ঞ।

কিন্তু অকস্মাৎ…চলমান এই ঘোটকের গতিরোধ করবার মানসে বলগা ধরে দাঁড়াল দুই বাংলার দুই পারে পুঁজিপতি, স্বার্থবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের দালালচক্র। শত শহীদের রক্ত সিক্ত হয় গঙ্গা-পদ্মার পাড়। সে ইতিহাস নির্মম, করুণ।

* * *

চতুর্থ নির্বাচন (১৯৫৭) এবং পরবর্তী অন্তর্বর্তী নির্বাচন (১৯৫৯) এ কংগ্রেসের পতন ও বামপন্থী যুক্তফ্রণ্টের উত্থান সম্ভব করেছিল একটানা কয়েক বৎসর ব্যাপী খাদ্য আন্দোলন। এপার বাংলার খাদ্য-আন্দোলন আর ওপার বাংলার ভাষা-আন্দোলন দুই বাংলার কায়েমী স্বার্থের তাঁবেদার সরকারের গদিকে নাড়া দিল। সেই কাহিনী এপার বাংলা ওপার বাংলার বারকোটি বাঙালীর কাহিনী।

দুই পারে দুই বাংলা। এপার বাংলার মানুষের কত সমস্যা! কংগ্রেস সকল সমস্যা সমাধান করতে পারে না। বৈদেশিক সাহায্যে বড় বড় রাস্তা, বড় বড় বাড়ি, বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও দেশের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সমাজের সমস্যার সুরাহা হয় না। সেই পুরাতন আমলাতান্ত্রিক ধাঁজের শাসন, সেই ধনতান্ত্রিক পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী আইনের নামে পুলিশীও সামরিক নির্যাতন, অর্থলোলুপ স্বার্থবাদী নেতাদের হীন উপদল পোষণ, ধনতান্ত্রিক দুর্নীতির প্রশ্রয় দান এবং জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে কংগ্রেস জনসাধারণের আস্থা হারায়।

চীন-ভারত সংঘর্ষ (১৯৫২) ও পাক-ভারত সংঘর্ষ (১৯৫৫)-এর জন্য দেশরক্ষার প্রশ্নে তৃতীয় নির্বাচনের পরীক্ষায় কংগ্রেস উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয় কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্রেসের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা জওহরলাল,

বিধান রায় এবং লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় ও সাধারণ মানুষের অধিকতম সমর্থনে বামপন্থী দলগুলির মধ্যে ক্রমশঃ সন্তোষজনক বুঝা-পড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ায় কংগ্রেসের আসন ভারতের সর্বত্র টলটলায়মান হয়।

চতুর্থ নির্বাচনে (১৯৫৭) এবং পরবর্তী অন্তর্বর্তী নির্বাচনে (১৯৫৯) বাংলার জনগণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এবং সম্মিলিত বামপন্থী দলগুলির ফ্রণ্ট, 'যুক্তফ্রণ্ট' পক্ষে রায় দিয়েছে।

১৯৪৭-১৯৫৯ সাল এপার বাংলার নানাপ্রকার অভূতপূর্ব কোলাহলের কাল।

স্বাধীনতা উত্তর কালে এই কাল এবার বাংলার ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় কাল। আমাদের সমসাময়িক এক সাংবাদিক এই কালের নাম দিয়েছেন—দিন বদলের পালা। আমি এর নাম দিচ্ছি—ভাঙাগড়ার খেলা।

এপার বাংলা

ভাঙাগড়ার খেলা ঃ

১৯৬০ সালে গঠিত যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভাঙার নায়ক রাজ্যপাল ধরমবীর ও খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের বিরুদ্ধে জনমত যখন সোচ্চার হয় তখন প্রফুল্ল ঘোষের সরকার—পি. ডি. এফ সরকারের অপমৃত্যু ঘটে (মার্চ, ১৯৬০) এবং পশ্চিম বাংলায় রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ হয়। বিক্ষুব্ধ জনমতের চাপে এক বৎসর রাষ্ট্রপতির শাসন চালু থাকার পর ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এই প্রথম অন্তর্বর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্ট বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয়। বাংলায় দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পত্তন হয়।

১৯৫৯ সাল। মে মাসের প্রথমদিকে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের পরলোকগমণে নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রশ্ন উঠে এবং এই প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও উপ-প্রধান মন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর মধ্যে মতান্তর ঘটে।

১৯৫৯ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি উপ-প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই পদত্যাগ করেন এবং আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভাঙনের মুখে অগ্রসর হয়। চ্যবনের আপোষ করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেস (সংগঠন)-এর মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হন এবং বামপন্থী দলগুলির মনোনীত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থিত শ্রীভি. ভি. গিরি রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হন।

এই ব্যাপারে জাতীয় কংগ্রেস ভাঙনের সূচনা হয়। সংগঠন কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্রপার্টি সমর্থিত (দেশাই-এর সিণ্ডিকেট দল) প্রার্থীর পরাজয় এবং শাসক কংগ্রেস ও বামপন্থী সমর্থিত (ইণ্ডিকেট) প্রার্থীর জয় এই ভাঙনের কারণ ।

নভেম্বরের প্রারম্ভে কংগ্রেস দ্বিখণ্ডিত হয় ও ইন্দিরা গান্ধী ওয়াকিং কমিটির সভা বর্জন করেন এবং এর ফলে জাতীয় কংগ্রেস থেকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা বহিস্কৃত হন কিন্তু সংসদে সদস্যদের সভায় শ্রীমতি ইন্দিরার জয় হয়।

নভেম্বরের মাঝামাঝি দুই কংগ্রেসের জন্ম হয়—কংগ্রেস সভাপতি নিজনিঙ্গপার সংগঠন কংগ্রেস (যাহা 'আদি কংগ্রেস' নামে পরিচিত) এবং প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরার শাসক কংগ্রেস (যাহা 'নব কংগ্রেস' নামে এখন খ্যাত)।

যুক্তফ্রণ্টে ভাঙন—শরিকী সংঘর্ষ (১৯৫৯ সালের শেষার্ধে)। হিংসা ও শরিকী সংঘর্ষের প্রতিরোধে পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে সুরু হয় অনশন সত্যাগ্রহ। তারপর ১৭ই এপ্রিল ১৯৫৯এ অজয় মুখার্জির পদত্যাগ। ভাঙল দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকার।

১৯৫০ সালের ২০শে এপ্রিল। বাংলা ৫ই চৈত্র, ১৩৫৬। পশ্চিম-বঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ হয়। রাষ্ট্রপতি শাসনের মধ্যে মার্কসবাদী বিরোধী সমস্ত শক্তি (কয়েকটি বামপ্রন্থী শরিক সহ) মার্কসবাদীদের উৎসাদনে কর্মতৎপর হয় এবং নব কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন 'ছাত্রপরিষদ' ও যুবসংগঠন 'যুব কংগ্রেস' শক্তিশালী হয়।

তারপর দ্বিতীয় অন্তর্বর্তী নির্বাচন—১৯৫৫। সি. পি. এম বিরোধী প্রচার সত্ত্বেও সি. পি. এমের আসন সংখ্যা ৮০ (১৯৫৫) থেকে বেড়ে ১১১ তে দাঁড়ায়।

অজয় মুখার্জির আশা ছিল এই নির্বাচনে সি. পি. এম তলিয়ে যাবে, আর তাঁর বাংলা কংগ্রেস দল হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কিন্তু বেহিসেবী রাজনৈতিক নেতা অজয় মুখার্জির হিসাবে ভুল হ'ল। তাঁর দল বাংলা কংগ্রেস নামল ৩৩ থেকে ৫এ।

নির্বাচনে সি. পি. এম দল ১১১টি আসন পেয়ে হল বৃহত্তম দল কিন্তু একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হতে পারল না।

এই সুযোগে নব কংগ্রেস মুসলিম লীগকে লুফে নিয়ে অন্যান্য মার্কসবাদী বিরোধী দলগুলির সহায়তায় সরকার গঠন করল।

এই আধা কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার আয়ু মাত্র তিন মাস। রাজ্যপাল শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান মন্ত্রিসভা তৈরী করে ছুটি নিলেন। এলেন নূতন রাজ্যপাল ডায়ার্স।

নবকংগ্রেসে উপদলীয় কোন্দল, সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত সুবিধা আদায়ের অপচেষ্টা ও শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনে সরকারী ঔদাসীন্যে ছাত্র-পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভে এই মন্ত্রিসভার পতন হ'ল এবং রাজ্যপাল ডায়ার্সের হাতে পুনরায় কায়েম হ'ল রাষ্ট্রপতি শাসন। ১৯৫৭ সনের পর এই নিয়ে পশ্চিম বাংলায় তিন বার রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত হয়।

১৯৫৫ সাল—ওপার বাংলার মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতালাভের কাল।

মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি ওপার বাংলার সংগ্রামকে সমর্থন করলেও পার্লামেন্টের মোট আসনের ছুই তৃতীয়াংশের অধিক আসনে জয়ী নবকংগ্রেসনেত্রী ইন্দিরার বাংলাদেশ সম্পর্কীয় কার্য ও নীতি সমর্থন না করায় ১৯৫২ সনের নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয় বরণ করল—যার ফলে আগামী পাঁচ বছরে (১৯৫৫-৫৭) এপার বাংলার ভাগ্য রূপায়নে মার্কসবাদী ও তার সঙ্গী দলদের কোন ক্ষমতা রইল না।

ওপার বাংলা

নির্বাচনী ভাঁওতার খেলা :

ওপার বাংলা। এপার বাংলায় যখন রাজনীতির ভাঙাগড়ার খেলা চলছিল তখন ওপার বাংলায় চলছিল নির্বাচনী ভাঁওতার খেলা। তার সূচনা—১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট। যেদিন মুসলমান-প্রীতি দেখিয়ে মুসলিম লীগ এই উপমহাদেশে পাকিস্তান কায়েম করল কিন্তু ছুদিন বাদে দেখা গেল যে মুসলিম লীগ নবাব-উজিরের প্রতিষ্ঠান এবং কায়েমী স্বার্থের রক্ষক—দরিদ্র কৃষক মুসলমানদের শোষক মাত্র।

ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে সোনার বাংলাও বিভক্ত হ'ল। পূর্ব-বাংলা—সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেশ পূর্ব বাংলা হ'ল পূর্ব পাকিস্তান। এই বাংলার উপর চলল স্বৈরাচারী লীগ সরকারের স্টীমরোলার। সবচেয়ে বড় আঘাত হল রাষ্ট্রভাষা উর্দু। পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু মুসলিম বাঙালীর দাবী হ'ল বাংলা হবে রাষ্ট্রভাষা। এই হ'ল পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন।

মুখে বাংলা গান বাংলা ছন্দ। রাজপথে নামলেন ওপার বাংলার তরুণ দল। সেদিন ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২। বাংলাভাষার শহীদ

জব্বার, রফিক, বরকত প্রমুখ উনিশজন বাঙালীর রক্তে লাল হ'ল ঢাকার রাজপথ। পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। যশোহরে, উত্তর বাংলায় এবং ঢাকার হাইকোর্টের সামনে সবুজ ঘাসের উপর চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হলেন আরও কুড়িজন বাংলা ভাষার ভক্ত সন্তান।

শহীদের খুনে পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হল। বাংলা ভাষা হ'ল পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

* * *

১৯৫৪ সাল। পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন এবং পূর্বপাকিস্তানে ফজলুল হকের নেতৃত্বে পত্তন হয় স্বল্পকালস্থায়ী যুক্তফ্রন্ট সরকার (৩রা এপ্রিল—৩০শে মে ১৯৫৪) কিন্তু ৩০শে মে রবিবার গভর্ণর জেনারেল গোলাম মহম্মদ গায়ের জোরে বে-আইনীভাবে ফজলুল হক ও তাঁর মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুত করে ওপার বাংলায় (পূর্বপাকিস্তান) গভর্ণরের শাসন প্রবর্তিত করলেন। ওপার বাংলায় গভর্ণর নিযুক্ত হলেন সেনাপতি জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা।

* * *

প্রগতিশীল মুসলিম বাংলার ক্রমাগত আন্দোলন চলে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামের পরিবেশ ওপার বাংলায় আওয়ামী লীগ সরকার এবং শেষে করাচীর প্রধানমন্ত্রীর গদিতে পূর্ববাংলার প্রতিনিধি সুরাবর্দি স্থান পান। পূর্ববাংলার ভূতপূর্ব রাজ্যপাল ইসকান্দার মির্জা হলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট। আওয়ামী লীগ সরকারের স্থিতিকাল ৮ই অক্টোবর, ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত।

* * *

আওয়ামী লীগ সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন মুজিবর রহমান। ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় মুজিবর ছিলেন কনিষ্ঠতম মন্ত্রী। আওয়ামী লীগের সংগঠনের জন্য তিনি মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন এবং লীগের সাধারণ সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করেন।

আওয়ামী লীগ পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলন আরও প্রবল হয়। পাকিস্তানকে যুদ্ধ জোটের কবল থেকে মুক্ত করবার জন্য একটা স্বাধীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির স্বপক্ষে আন্দোলন দিন দিন প্রবল হয়। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এই আন্দোলনে সন্ত্রস্ত হন এবং প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তন করলেন—৮ই অক্টোবর, ১৯৫৮।

২৫শে অক্টোবর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আয়ুব খাঁ (তখন প্রধান সামরিক শাসক) প্রধানমন্ত্রী হন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার মন্ত্রিসভা বারজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় কিন্তু ২৭শে অক্টোবর তারিখে ইস্কান্দার আয়ুবের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে বাধ্য হন। ২৮শে অক্টোবর তারিখে আয়ুব প্রেসিডেন্ট রূপে মন্ত্রীসভা গঠন করেন এবং ইস্কান্দার করাচী থেকে কোয়েটার পথে বৃটেনে পলায়ন করেন।

* * *

আয়ুবের শাসনকাল ১৯৫৭ সালের অক্টোবর—১৯৬৯ সালের মার্চ। এই দশশালা শাসনের প্রথমার্ধ একচ্ছত্র সামরিক শাসন এবং শেষার্ধ মৌলিক গণতন্ত্র—মুষ্টিমেয় ধনীর শাসন। অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় বিদ্রোহ হয় সীমান্ত প্রদেশে, অধিকৃত কাশ্মীর ও পূর্ব পাকিস্তানে। আয়ুব খাঁর আমলে মুজিবের ভাগ্যে জুটল আটক আর ফৌজদারি মামলা—একটার পর একটা। শেষকালে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'।

প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের মুখে আয়ুব কুখ্যাত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করলেন এবং গণনেতা মুজিবকে মুক্তি দিলেন। প্রত্যক্ষ করলেন শাসকের গুলি ফুরোয় কিন্তু গণবিক্ষোভ থামে না। ফলে ইয়াহিয়ার হাতে সামরিক শাসনভার অর্পণ করে আয়ুব বিদায় নিলেন—২৫শে মার্চ, ১৯৫৮।

নির্বাচনের ভাঁওতা নিয়ে এলেন ইয়াহিয়া। ইয়াহিয়ার মুখে মধু, অন্তরে হলাহল। তিনি আয়ুবের প্রতিশ্রুতি—ফেডারেল পার্লামেণ্টারি পদ্ধতির সরকার ও প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার মেনে আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে প্রদেশগত পাঁচটি ইউনিট গঠনে মত দিলেন কিন্তু ছয়দফাপন্থী মুজিবের স্বায়ত্ত শাসনের দাবীকে আমল দিলেন না—পরন্তু ভুট্টোর ইসলামী সংবিধানকে মদত দিয়ে নির্বাচন বানচাল করবার ক্ষমতা নিজের হাতে রাখলেন।

পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন—৭ই ও ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮। মারাত্মক ঝড়ঝঞ্ঝার ধ্বংসলীলার মধ্যে পশ্চিম ও পূর্বপাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগ জাতীয় সভার নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল এবং প্রাদেশিক সভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। ফলে ৩রা মার্চ, ১৯৫৮ এ ঢাকায় পাকিস্তানের নবনির্বাচিত জাতীয় সভার অধিবেশন আহুত হ'ল কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পিপলস্ পার্টির নেতা ভুট্টোর বয়কটের হুমকির কাছে নতি স্বীকার করে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য অধিবেশন মুলতুবি রাখলেন।

১লা মার্চ, ১৯৫৮ সাল।

বিক্ষোভে ফেটে পড়ল নবজাগ্রত পূর্ববাংলা।

বেপরোয়া গুলি চলে। মানুষ মরে, তবুও ভয় পায় না।

রক্তস্নাত পূর্ব বাংলায় অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন মুজিবর রহমান। দেশের নাম হ'ল 'বাংলা দেশ'।

ভারতের অন্তর্গত পশ্চিম বাংলা এখন তাদের পর নয়। করাচী, ইসলামাবাদের দিকে আর এখন তাদের দৃষ্টি নেই। তাদের দৃষ্টি

ন্নর ওপার থেকে এপারে।

স্বাধীনতার পথে বাংলা দেশ। বাংলা দেশের শাসনভার হাতে নিলেন মুজিব।

* * *

১৯৫৮। ঢাকায় এলেন ইয়াহিয়া। মুজিবরের সঙ্গে সমঝোতায় বসলেন তিনি। পিছু পিছু এলেন ভুট্টো। ভুট্টোর কুপরামর্শে ২৬শে মার্চ বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রিতে ইয়াহিয়া তাঁর সেনাবাহিনীকে বেপরোয়া বাঙালী হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণের আদেশ দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করলেন। পাকবাহিনীর হত্যা লীলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ ও মুক্তির জন্য অস্ত্র ধরল বাঙালী গেরিলা।

দশমাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮এ বাঙালী গেরিলা ভারতের সহযোগিতায় বাংলাদেশকে পাক সৈন্যের কবলমুক্ত করল।

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সারা পৃথিবী ঘুরে বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের যৌগিকতা প্রতিপন্ন করেছেন এবং সোভিয়েট রাশিয়াকে মিত্র করে সৎসাহসের সঙ্গে আমেরিকা ও চীনের হুমকি উপেক্ষা করে যথাসময়ে পাক-আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের আহ্বানে সৈন্য পাঠিয়ে বাংলাদেশকে পাক-কবলমুক্ত করেছেন।

বাংলাদেশের প্রশ্নে ইন্দিরা গান্ধীর ধীর সুচিন্তিত ফলদায়ক পদক্ষেপে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনের হীন ষড়যন্ত্র যেমন ব্যর্থ হয়েছে তেমনি ভারতের মানবতার উচ্চতম আদর্শকে বিশ্বের দরবারে ভাস্বর করেছে।

এপার বাংলায় নবকংগ্রেস

১৯৫৮-এর নির্বাচন ও নব কংগ্রেসের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রতীয়মান হয় যে পশ্চিম বাংলার জনগণ কেন্দ্র থেকে স্বাতন্ত্র্য চায়

না—কারণ মার্কসবাদীদের নির্বাচনে প্রধান আওয়াজ ছিল পশ্চিম বাংলাকে কেন্দ্রের উপনিবেশ হতে দেওয়া হবে না। মার্কসবাদীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেও মার্কসবাদীদের আওয়াজ কেন্দ্রের তুলো দেওয়া কানে এদ্দিন পরে প্রবেশ লাভ করেছে। যার ফলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিম বাংলার সমস্যাকে প্রাধান্য দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পশ্চিম বাংলার সমস্যার সমাধান না করতে পারলে যে রক্তাক্ত বিপ্লবের আবির্ভাবের সম্ভাবনা তাও প্রধানমন্ত্রী যে স্বীকার করেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

পরীক্ষা আজ ইন্দিরা গান্ধীর নব কংগ্রেসের সামনে। খাদ্যসমস্যা সমাধানে অপারগতার জন্য প্রাক্তন কংগ্রেসীরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হন এবং খাদ্য আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বামপন্থীরা জনগণের জীবনের সাথে সামিল হতে সমর্থ হন। প্রাক্তন কংগ্রেসের বিকৃতি এবং বামপন্থীদের হানাহানি নব কংগ্রেসের সম্মুখে এনেছে এই পরীক্ষা।

বিক্ষুব্ধ বাংলার সমস্যা সমাধানের ভিতর দিয়ে নব কংগ্রেসকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। শুধু শান্তিশৃঙ্খলা সমস্যা নয়। যখন বিক্ষোভের কারণ দূরীভূত হবে তখন দেশে শান্তিশৃঙ্খলা আসবে। শান্তিশৃঙ্খলার নাম করে বিক্ষোভ চাপা দিতে গেলে সমস্যা সমাধান হবে না। সমস্যা বহুবিধ: অর্থনৈতিক বৈষম্য, মুনাফা-মৃগয়া, বিকৃত সংস্কৃতি আর দিনমজুর, ভূমিদাস, উদ্বাস্তু ও নিম্নমধ্যবিত্তদের মানুষের মত বাঁচবার প্রশ্ন।

নব-কংগ্রেসের এই পরীক্ষা ব্যর্থ হবে যদি এখনও বঞ্চিত, শোষিত ও সর্বহারাদের মুক্তি না হয়। যাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী নিরুপদ্রবে সর্ব সুখ ভোগ করে আসছেন গান্ধীজীর 'সকলের মঙ্গল' নীতি অনুযায়ী যদি তাঁদের এখনও সর্বসুখ অটুট থাকে তা হ'লে বৃথা এ বরণ ডালা। এরই জন্য মানুষ 'বন্দেমাতরম' ভুলে ধরেছিল 'ইনকিলাব' বুলি। উপেক্ষা আর উপহাস করে ইনকিলাব ভোলানো যায় না—ভোলানো যায় একটা শ্রেণীর বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার অবসানে

আর সেই শ্রেণী কারা বলুন ত'—আপিসবাবু, শিক্ষাব্রতী, শ্রমজীবি নয়…এরা উপেক্ষিত দিনমজুর, ভূমিদাস, কারিগর, নিম্নমধ্যবিত্ত ও উদ্বাস্তু। এদের কাছেই এখনো লুকানো আছে বিপ্লবাগ্নির ছিটে ফোঁটা।

ওপার বাংলায় স্বাধীনতা

পাকিস্তানের স্রষ্টা ইংরাজ। পাকিস্তানের সামরিক সরকারের স্রষ্টা মার্কিন (অক্টোবর-১৯৫৮)।

১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট যে ভারত বিভাগের মধ্যে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের সৃষ্টি তা স্বাধীনতার নামে ভুয়া স্বাধীনতা—যার মধ্যে লুকায়িত ছিল চির বিরোধের বীজ, চিরবন্ধনের জ্বালা। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের এটাই শেষ পদাঘাত।

ভারত দাঁড়িয়ে আছে ভাষাবৈষম্য, প্রাদেশিকতা, জাতিভেদ, শ্রেণীদ্বন্দ্ব, মতবাদের ভিড়, স্বার্থবাদী দলাদলি আর হানাহানি রাজনীতির সুপ্ত বিস্ফোরণের উপর, আর পাকিস্তান দাঁড়িয়ে আছে ইসলাম ও সংহতির ভাঁওতাবাজির আড়ালে ভাষা-বিরোধ ও প্রাদেশিকতা, আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী, ধর্মনিরপেক্ষতার আবেদনের সুপ্ত বিস্ফোরণের উপর—যার প্রকাশ বাংলার বিদ্রোহ ও স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি (ডিসেম্বর ১৬, ১৯৫৮)।

বাংলার মুক্তি-আন্দোলনের হোতা বিদ্রোহী বাঙালী ও তার সমর্থক ভারত ও ভারতমিত্র সোভিয়েট রাশিয়া।

বৃটিশের পাকিস্তান সৃষ্টি ও মার্কিনের লালন, পালনের কারণ পাকিস্তানকে দিয়ে সব সময়ে ভারতকে দাবিয়ে রাখার চক্রান্ত—চক্রান্ত যাতে ভারত তাদের সমকক্ষ হতে এবং জগৎসভায় গৌরবময় আসন লাভ করতে না পারে।

কিন্তু প্যান-ইসলামের আসরে বসিয়ে রেখে ও সামরিক জোটে সাথী করে মার্কিনের লালনপালন যখন মার্কিনের দুষ্ট স্বার্থবুদ্ধিকে প্রকট করল তখন উগ্র প্যান-ইসলামের ভাষা প্রশ্নে বাঙালীর মোহ ভাঙল এবং ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের বন্যায় বাঙালী জাগল। এই গণজাগরণ শুধু বাংলায় নয়,—পাখতুন, বালুচি ও সিন্ধীদের মধ্যেও দেখা দিচ্ছে।

জিন্নার দ্বিজাতি-তত্ত্ব ও ধর্মীয় রাষ্ট্রের স্বপ্ন বিংশ শতাব্দীর শেষ বেলার উজ্জ্বল রৌদ্রের সামনে ভারত উপমহাদেশের প্রাঙ্গণে আজ মিথ্যা প্রমাণিত।

১৯৫৮ সালের শেষার্ধের ইসলামাবাদ ও ঢাকার চমকপ্রদ ঘটনা তার সাক্ষ্য। ঢাকায় ভারতীয় জওয়ান ও বাঙালী মুক্তি-সেনার কাছে পাক-সৈন্যের আত্মসমর্পণ ও বিচ্ছিন্ন স্বাধীন বাংলার বাস্তবতা রুঢ় আঘাত হানল ইসলামাবাদের বক্ষে। মদ্যপ ও লম্পট পাকসেনার নিন্দায় সোচ্চার বাংলার-তরুণরা ভাঙল বার, হোটেল, রেঁস্তোরা।

বিক্ষোভের মুখে ইয়াহিয়া পাকিস্তানের শাসনভার ভুট্টো-গুল আঁতাতের হাতে সমর্পণ করে আত্মগোপন করেছেন।

এখন ভুট্টো প্রেসিডেণ্ট ও সামরিক প্রশাসক, আর টিক্কা খান প্রধান সেনাপতি। ভুট্টো-টিক্কা আঁতাতের সামনে এখন বড় প্রশ্ন: বিশ্বের সেরা (!) ফৌজ পাকফৌজের ভারতীয় জওয়ানদের হাতে পরাজিত।

সিন্ধুর বিরাট অঞ্চল ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের অংশবিশেষ এখন ভারত কর্তৃক অধিকৃত। লক্ষ পাকসেনা এখন ভারতের হাতে যুদ্ধবন্দী। সর্বোপরি বিচ্ছিন্ন পূর্ব বাংলা আজ মুক্ত—স্বাধীন বাংলা এখন বাস্তব সত্য। যাদের সতের জন ঘোড়সওয়ার নাকি একদিন বাংলা জয় করেছিল তাদের এ কি পরাজয়!

কিন্তু ভুট্টোর এখনও খোয়াব—পাকিস্তানের ঐস্লামিক কাঠামোর মধ্যে বিচ্ছন্ন বাংলাকে তিনি আবার পুরবেন তা যে কোন

মূল্যেই হোক না কেন! ঢিলা কনফেডারেশন—এমন কি মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর পদ দিতেও তিনি আগ্রহী।

ধন্য ভুট্টো! বিগত সালের মার্চমাসে ঢাকায় এ কথাটা স্বীকার করলে ব্যাপারটা এতদূর গড়াত না। এত নরবলি, এত নারী নির্যাতন, এত ধ্বংসের কি প্রয়োজন ছিল? তখনই হয়ে যেত সমাধান। এখন আর কিছু হবার নয়! স্বাধীন বাংলা এখন এগোবার পথে পা বাড়িয়েছে—পিছনের পথে পা বাড়াবে না আর।

তবু ভুট্টো নিরস্ত নন। লায়ালপুরের নির্জন কারাকক্ষ থেকে মুজিবকে মুক্ত করে পিণ্ডির রাজভবনের কাছে গৃহবন্দী করে তাঁর কানে কানে বলেছিলেন—বাংলাদেশ এখন ভারতীয় সৈন্যদের করতলগত এবং আপনি সেখানে অনভিপ্রেত।

ভুট্টো পাকিস্তানে নূতন প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করেছেন। ন্যাপের উপর থেকে তুলে নিয়েছেন তিনি ইয়াহিয়া আরোপিত নিষেধাজ্ঞা। চার প্রদেশে বসিয়েছেন চারজন নূতন গভর্ণর। নুরুল আমিনকে নিয়ে তৈরী করেছেন নূতন মন্ত্রীসভা। সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে ঢেলে সাজাতে সুরু করেছেন রাষ্ট্রীয় কাঠামো। শিল্প জাতীয়-করণ ও রাজন্যভাতা বিলোপ সাধনেও ব্রতী হচ্ছেন কিন্তু ইতিমধ্যেই দেখা দিচ্ছে গলদ, নিজ দল পিপলস্ পার্টির লোকদের চাকুরী দেবার ব্যাপারে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির লোকদের সাথে পিপলস্ পার্টির লোকদের মারামারি হয়ে গেল সেদিন। কে জানে ভুট্টো আর কতদিন?

পাকিস্তানের স্বঘোষিত প্রেসিডেন্টরা ভারতবিদ্বেষ পুঁজি নিয়ে ধরে রেখেছেন প্রেসিডেন্টের গদি। মনে হয় ভুট্টোও হবেন না তার ব্যতিক্রম। তাঁর সমাজতান্ত্রিকতা, পাকিস্তানের ঐশ্লামিক কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশকে পুনরানয়নের জন্য তাঁর ঘোষিত সঙ্কল্প এবং সর্বোপরি ভারতের হাতে পাকফৌজের নিদারুণ পরাজয়ে তাঁর বদলার

প্রতিশ্রুতি প্রেসিডেণ্টের গদি আঁকড়ে ধরে থাকবার তাঁর নিছক পুঁজি মাত্র।

অতএব স্বাধীন বাংলাদেশ সাবধান। ভারতও হুঁশিয়ার!

ইউ. এন. ও-তে কাশ্মীর প্রশ্নে রাশিয়ার ভারতপক্ষ অবলম্বনে অহেতুক ভারতবিদ্বেষী পাকিস্তান ষোল আনা ভারতদ্বেষী ইঙ্গ-মার্কিন না হওয়ায় ইউ. এন. ও বিরোধী মনোভাবাপন্ন চীনের দিকে ঢলে পড়ে। চীন-ভারত এবং পাক-ভারত যুদ্ধের পর পাকিস্তান যাতে চীনের দিকে পুরোপুরি ঢলে না পড়ে সেজন্য ইঙ্গ-মার্কিনের যেমন মাথাব্যাথা, রাশিয়ারও হ'ল তেমন মাথাব্যাথা। তাই যখন পাকিস্তান চীনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তখনই ইঙ্গ-মার্কিন এবং তৎসঙ্গে রাশিয়া অস্ত্র, অর্থ পাঠিয়ে পাকিস্তানকে নিজেদের দিকে টেনে রাখতে চায়।

বিংশ শতাব্দীর ষাট শতকের শেষার্ধে চলেছে পাকিস্তান নিয়ে রাজনীতির এই খেলা। ইঙ্গ-মার্কিন ও রাশিয়ার কাছ থেকে অর্থ ও অস্ত্র আদায় করবার সুবিধাবাদী উদ্দেশ্যে পাকিস্তান হয়ে আছে চীনঘেঁষা। পাকিস্তানের ল্যাজ ধরে ইসলাম দুনিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর নিরাপদে পার হবার জন্য মার্কিন আজ চীনের সাথে সহাবস্থান করছে। চীন-ভারত মৈত্রীর সময় ভারত যখন চীনকে ইউ. এন. ওতে আনতে চেয়েছিল তখন চীনের সামনে ইউ. এন. ও-র দ্বার রুদ্ধ করেছিল এই মার্কিন। সেই মার্কিন আজ চীনের মিত্র, আর সেই ভারত আজ চীনের চক্ষুশূল শত্রু। বিশ্ব-রাজনীতি প্রহেলিকাময়। সহাবস্থানে অবস্থিত মার্কিনের ইস্রায়েল প্রীতি ও রুশিয়ার আরব-মৈত্রী—একের ভিয়েতনামে যুদ্ধ ও অপরের ভিয়েতনামে সাহায্য সহাবস্থানের আর এক দৃশ্য।

সত্তর দশকের কালচক্রের যাত্রা এখন। এ দশকে যুদ্ধ ও বিপ্লবের আশঙ্কা ভারত উপমহাদেশে আজ বাস্তবে রূপান্তরিত। হিটলারের বার্লিনস্থ টিলা আর স্যাকসন হাউস থেকে মুঠো মুঠো

জ্বলন্ত বারুদ নিয়ে এই উপমহাদেশে আগুন লাগাতে চায় বেনিয়া অস্ত্র-ব্যবসায়ী। ভিয়েতনাম ও ইস্রায়েলের নিবন্ত আগুন জ্বলে উঠেছিল পদ্মা মেঘনার চরে। পদ্মা-গঙ্গার অপর নাম। দুই নদীর দুই তীরে আগুনজ্বালার পালা দিয়েছেন ভেঙে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। পৃথিবীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের ইতিহাসে এ এক নূতন দৃষ্টান্ত।

স্বাধীন এখন বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতায় মার্কিন সরকার ও অন্যান্য পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক দেশের ভূমিকা আজ আর কারও অজানা নয়। আজ সেই মার্কিন সরকার স্বাধীন বাংলাদেশের পুনরুজ্জীবনের জন্য অর্থের থলি নিয়ে এগিয়ে আসছে। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে মার্কিন সমর্থকদের সংখ্যাও কম নয়। অতএব বাংলার স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারকে বাংলাদেশে মার্কিনী অর্থ অনুপ্রেবেশের বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের প্রধান সহায়ক ভারত সরকারের পক্ষে অনুরূপ সজাগতার প্রয়োজন। নচেৎ বহুকষ্টে অর্জিত এই স্বাধীনতা নষ্ট হবে। চীন শোষিত মানুষের মুক্তিদাতা হিসাবে বাঙালীর শ্রদ্ধা পেয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীনতার প্রশ্নে ভারত বিরোধী ও সোভিয়েত বিরোধী মোহাচ্ছন্নতায় চীনের বিরোধিতা বাংলাদেশের মানুষদের তিক্ত করেছে এবং মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের সহিত চীনের একজোটত্বে চীনের সমাজতান্ত্রিক চরিত্র সম্বন্ধে বাঙালী এখন সন্দিহান। তাই স্বাধীন বাংলার মানুষরা তাদের দেশের অভ্যন্তরে নানা স্বার্থের জলঘোলানি সম্পর্কে অবহিত।